সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

এপ্রিল ২০১৮

মোদি দর্শন, সুষমার আন্তরিকতা এবং আমার সোনার বাংলা...

উপরে বামে: ৪ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশের মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নানের উদ্বোধনক্রমে ঢাকায় 'দ্য এগ্রিকালচারাল এন্ড প্রসেসড ফুড প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র আয়োজনে 'ইন্ডিয়ান এগ্রো প্রোডাক্টস বায়ার-সেলার মিট'-এ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

উপরে ডানে: ৫ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের দিল্লিতে আন্তর্জাতিক সৌর জোটের সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং অসম ও মেঘালয় সফরের প্রাক্কালে সঙ্গে তাঁর ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সৌজন্য সাক্ষাৎ

ডানে: ১৮ মার্চ ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)-কে তাঁর কার্যালয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বামে
১৯ মার্চ ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশের সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, পিএইচডি, গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং গবেষক তৌফিক খানের সঙ্গে মত বিনিময়

নিচে বামে
২০ মার্চ ২০১৮ 'বিমসটেক অ্যাট ইটস ২০: টুওয়ার্ডস আ বে অফ বেঙ্গল কমিউনিটি'র সমাপনী পর্বে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

নিচে ডানে
২৪ মার্চ ২০১৮ বারিধারা ডিওএইচএস কনভেনশন সেন্টারে বঙ্গদেশ তামিল সঙ্গম আয়োজিত পোংগাল ভিজা ২০১৮-য় পোংগাল বাস্তুকলে তামিল সম্প্রদায়কে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৬ | সংখ্যা ০৪ | চৈত্র ১৪২৪-বৈশাখ ১৪২৫ | এপ্রিল ২০১৮

High Chommission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

বাংলা নববর্ষ প্রসঙ্গ
পৃষ্ঠা: ২৬-৩৫

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ — আইটেক এবং আইসিসিআর দিবস ২০১৮ ০৪
সম্পর্ক — ভারত-বাংলাদেশ আলোচনায় বিদেশসচিবের বক্তৃতা ০৬
সৌহার্দ — মোদি দর্শন, সুষমার আন্তরিকতা এবং আমার সোনার বাংলা মিথুন আশরাফ ০৯
কবিতা: একশোজনের তরুণদল ॥ সুমন সাহা ১৩
বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন সংস্কৃতি ॥ আরাফাত জোবায়ের ১৪
আমার দেখা ভারত ॥ তানিয়া এ্যানি ১৫
তারুণ্যের সেতুবন্ধন ॥ জয়শ্রী ভাদুড়ী ১৮
ভ্রমণ — পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরতম গ্রাম ॥ আসিফ আজিজ ২১
কবিতা — অমিতাভ মীর ॥ নমিতা চৌধুরী
অনীক মাহমুদ ॥ শুভংকর সাহা ২৪
শেখর বালা ॥ বিশ্বজিৎ মণ্ডল
মোমিন মেহেদী ॥ নিদেল শরিফ ২৫
নববর্ষ — বাংলা নববর্ষ আমাদের প্রাণের উৎসব শামসুজ্জামান খান ২৬
প্রসঙ্গ বাংলা নববর্ষ ॥ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ২৮
এসো বৈশাখ, রাজসমারোহে এসো জামিরুল ইসলাম শরীফ ৩৪
অনুবাদ গল্প — দ্বিতীয়বার বিয়ে ॥ অমিত চৌধুরী ৩৬
প্রবন্ধ — স্বতন্ত্র কমলকুমার মজুমদার ॥ এমিলি জামান ৩৮
শিক্ষা বৃত্তি — মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ স্কিম ৪০
রাজ্য পরিচিতি — অন্ধ্র প্রদেশ ॥ আর ভি আর চন্দ্রশেখর রাও সুধীর ভেঙ্কটেশ বনমালী ৪১
রান্নাঘর — অন্ধ্র প্রদেশের রান্না ৪৭
শেষ পাতা — বিশ্বশ্রুত চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ॥ কনকরঞ্জন দাস ৪৮

পৃষ্ঠা ০৯ থেকে ২০

প্রধানমন্ত্রীসকাশে বাংলাদেশের তরুণ প্রতিনিধিদল

অপেক্ষার প্রহর যেন শেষই হতে চায় না। কখন আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এ যেন আকাশের 'চাঁদ' হাতে পাওয়া হবে। শেষপর্যন্ত সেই 'চাঁদ' মিলল। দর্শন মিলল বিশ্বের সেরা ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রীদের অন্যতম শ্রী নরেন্দ্র মোদির। দেখা হতেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আবার যা বললেন, তাতে মুগ্ধতাই শুধু ছড়াল। বললেন, 'আমার সোনার বাংলা'। এমনভাবে মায়াভরা কণ্ঠে তিনি কথাগুলো বললেন, যেন প্রাণপ্রিয় তরুণদের কাছে পেয়েছেন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সফরে যাওয়া বাংলাদেশের একশো তরুণ প্রতিনিধির সবাই অভিভূত। তাঁর দর্শন পাওয়া এবং তাঁর কণ্ঠে শোনা, 'আমার সোনার বাংলা' যেন মনের গভীরে চিরদিন স্থান করে নিল।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ০২ ৯৫৬৩৫৭৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

ভারত বিচিত্রার সঙ্গে দুই দশক

তোমাকে প্রথম হাতে তুলে নিয়ে পড়ার দৃশ্যটা এখনো অমলিন প্রিয় *ভারত বিচিত্রা*। ১৯৯৭ সালে ফাগুনের এক মন মাতাল করা দুপুরে স্কুল লাইব্রেরির কোণে ফেলে রাখা পুরনো বই ও ছেঁড়া পত্রিকার ডাঁইয়ের মধ্যে তোমাকে আমি আবিষ্কার করেছিলাম। পুরনো কয়েকটি সংখ্যার প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি দেখে ভাল লেগে গেল খুব। কয়েকটি কবিতা তখনই পড়ে ফেললাম। পুরনো যতগুলো সংখ্যা পড়ে ছিল আমি সংগ্রহ করলাম। সংখ্যাগুলো ছিল ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ের। আমার গল্প-কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক হওয়ার ক্ষেত্রে *ভারত বিচিত্রার* ভূমিকা সর্বাধিক। সেই থেকে *ভারত বিচিত্রা* আমার স্বপ্নসঙ্গী।

অনেক দেরি করে নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যাটি হাতে পেলাম। আর অতিক্রম করলাম পত্রিকার সঙ্গে আনন্দময় পথ চলার ২০ বছর। এক সময় স্বপ্ন দেখতাম অন্যদের মত আমার ঠিকানায়ও *ভারত বিচিত্রা* আসবে। আজ প্রায় ২ বছর হল সে স্বপ্নও পূরণ হয়েছে। এখন আমি একটা আস্ত *ভারত বিচিত্রার* মালিক, ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

এখনো প্রতি মাসে অপেক্ষায় থাকি কখন পাব সুখপাখি নামের *ভারত বিচিত্রা* পত্রিকাটি। কখনো কখনো এ অপেক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। তবুও হতাশ হই না, আশায় আশায় থাকি...

শেখর বালা
গ্রাম- বেলেডাংগা, ডাক- জোয়ারিয়া
টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ

আমরা ভুলি না

অমিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশে পদ্মামায়ের
মিষ্টি জলের ঢেউ–
নীরব স্রোতে গান গেয়ে যায়
শুনছে না তো কেউ।

পাহাড় নদী দোয়েল পাখি
সবুজ গাছে গাছে–
বাংলাদেশের সোনার মাটি
আলোয় ভরে আছে।

স্বপ্ন দিয়ে কে সাজালো
তোমার মহিমা?
'বাংলা আমার মাগো তুমি
পদ্মা আমার মা'।

পুবের সাগর ধুইয়ে দিল
তোমার চরণখানি–
তোমার মুখে সূর্যালোকে
সাজায় রূপের রানি।

কোন আঁধারে বন মাঝারে
জোনাক জ্বালায় আলো–
মাগো, তোমার অলংকারে
মঙ্গলদীপ জ্বালো।

বুড়িগঙ্গা কইছে কথা
সবার কানে কানে–
শাপলা-শালুক মুক্তো ঝিনুক
রঙিন মাছের প্রাণে।

আন্দোলনের বাংলা ভাষা,
বাংলা আমার মা।
অমর শহিদ, সেলাম তোমায়–
আমরা ভুলি না।

অমিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় রাজনীতিবিদ

● বাংলাদেশে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তাৎক্ষণিকভাবে কবিতাটি লিখেছিলেন – সম্পাদক।

দিল্লিতে আন্তর্জাতিক সৌর জোটের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি

ক্ল্যাসিক পত্রিকা

আন্তরিক শুভেচ্ছা নেবেন। *ভারত বিচিত্রা* একটা ক্ল্যাসিক পত্রিকা, আমার খুব প্রিয় পত্রিকা, ভাল লাগার একটা পত্রিকা। হাতের কাছে পাই না বলে সব সময় পড়তে পারি না। আমি কবিতা লিখি। পত্রিকায় মুদ্রিত কবিতাগুলো পড়ে এর প্রকরণ বোঝার চেষ্টা করি। সম্প্রতি এ পত্রিকারই একটি সংখ্যায় ঘোষণা দেখলাম যে, এখন থেকে ডাক যোগে বিনামূল্যে *ভারত বিচিত্রা* পাঠানো হবে। আমি পত্রিকাটির খুবই ভক্ত– নিয়মিত পড়তে চাই। তাই আমার নাম ঠিকানা দিয়ে চিঠি পাঠালাম। দয়া করে আমার ঠিকানায় *ভারত বিচিত্রা* পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

রাহান তাপস
ইস্টার্ন হাউজিং প্রকল্প, সি-৩২ আরসিন গেট,
পোস্তাগোলা, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪

ঘটনাপঞ্জি ❖ এপ্রিল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

০৫ এপ্রিল ১৯৩২	❖	ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৫ এপ্রিল ২০০৭	❖	কথাকার লীলা মজুমদারের মৃত্যু
০৬ এপ্রিল ১৯৩১	❖	অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের জন্ম
০৯ এপ্রিল ১৮৯৪	❖	সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ এপ্রিল ১৯৫০	❖	আইসিসিআর-এর প্রতিষ্ঠা
১০ এপ্রিল ৫৮৯ খ্রি.পূ.	❖	বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ
১০ এপ্রিল ১৯০১	❖	কবি অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম
১২ এপ্রিল ৫৯৯ খ্রি.পূ.	❖	জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম
১৪ এপ্রিল ১৮৯১	❖	সংবিধানপ্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম
১৫ এপ্রিল ১৮৭৭	❖	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম
১৬ এপ্রিল ১৮৮৫	❖	বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্ম
১৬ এপ্রিল ১৯৫১	❖	সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের মৃত্যু
১৭ এপ্রিল ১৯৭৫	❖	রাষ্ট্রপতি সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মৃত্যু
১৭ এপ্রিল ১৯৮৩	❖	সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যালের মৃত্যু
১৮ এপ্রিল ১৮০৯	❖	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম
২৩ এপ্রিল ১৯৯২	❖	চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু
২৬ এপ্রিল ১৯২০	❖	অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যু
২৬ এপ্রিল ১৯৬০	❖	রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর মৃত্যু

এপ্রিলকে যদিও ইংরেজ কবি 'ক্রুয়েলেস্ট মান্থ' বলেছেন। কবিরা সত্যদ্রষ্টা– সত্যি কথাই বলেছেন কবি। আমাদের পত্রিকায় যে ঘটনাপঞ্জি আমরা ছাপি, সেটায় ভাল করে চোখ বোলালে কবির কথায় সত্যতা মেলে। এ-মাসে আমরা বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসু, কথাশিল্পী লীলা মজুমদার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিশ্ববিশ্রুত চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়, অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মত প্রতিভাবান ভারতীয়দের হারিয়েছি। অতি সম্প্রতি এ মৃত্যুমিছিলে যোগ দিলেন আমাদের প্রিয় কবি এবং দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের প্রধান যোগসূত্র বেলাল চৌধুরী। তিনি ছিলেন *ভারত বিচিত্রা*র সম্পাদক। দীর্ঘ এক যুগের সুযোগ্য সম্পাদনায় তিনি পত্রিকাটিকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, যা আমাদের জন্য এক অননুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। কিন্তু জরা-মৃত্যুশোক পেছনে ফেলে আমাদের তো সামনে এগোতেই হবে। পূর্বপুরুষদের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরই, তবেই না তাঁদের প্রতি হবে আমাদের সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন!

নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্যে সব দেশের সব জাতির মত বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চৈত্রের দাবদাহ দিয়ে যাত্রা শুরু করে ছয়টি ঋতুর লীলাবৈচিত্র্যে কখনও রূপমাধুরী কখনও বৈরাগ্য দেখতে দেখতে বছর কেটে যায়। এর মাঝে দেখা দেয় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, অতিবৃষ্টি; সমাজ ও জাতীয় জীবনে নৈরাজ্য আর হতাশাও মাঝে মাঝে জায়গা করে নেয়। কিন্তু সেগুলিই সব নয়। কর্মপ্রেরণা আর কর্মোদ্যোগে জেগে ওঠা নবীন আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ প্রকাশও তো নতুন বছরে দেখা যায়। পুরাতন বছরের গ্লানি থেকে শিক্ষা আর প্রেরণা নিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে জীবনের প্রয়াস। কোন কিছুই নিরর্থক নয়, হারিয়ে যাওয়া নয়। বৈশাখী মুকুল যেমন নবীন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়, তেমনই চৈত্রশেষের ঝরাপাতাও রেখে যায় বিগত বছরের স্মৃতি আর স্বাক্ষর। আমরা পুরনোকে পেছনে ফেলে নতুনের আবাহনে মেতে উঠি। ভারতজুড়ে শুরু হয় নতুন বছর উদ্‌যাপনের হিড়িক। শুধু বাংলাদেশ-ভারত নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নববর্ষ পালনের একটি তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ চলতি সংখ্যার আকর্ষণ। আশা করি রচনাটি পাঠকদের ভাল লাগবে।

বাঙালির একান্ত নিজস্ব বৈশাখী মেলা আর হালখাতা অনুষ্ঠানের সূচনা তো নতুন বছরের শুভারম্ভেই। পুরনো বছরের ধারদেনা, কায়-কারবারের পাওনা-গণ্ডার হিসেব-নিকেশ শুরু হয় হালখাতার উৎসবকে কেন্দ্র করেই। গ্রামে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে বৈশাখী মেলার আয়োজন চলে নানাভাবে। শুধু তো মেলা নয়, বৈশাখের আবাহনে আকর্ষণীয় নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, বইয়ের প্রকাশনা উৎসব– সবকিছুর মধ্যে নাগরিকমন যেন খুঁজে ফেরে নতুন বছর শুরু করার প্রেরণা। ভোরের আলো ফুটতেই বৈশাখী গানে গানে পথে পথে মানুষের ঢল নামে। একে-অপরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে পরিপূর্ণ হতে থাকে প্রাণের মিলন। ছুটির দিনটিকে আরও নিবিড় আরও সার্থক করে তোলার বাসনায় পারিবারিক পরিমণ্ডলও সাধ্যমত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর করে তোলার প্রয়াস চলে সকলে মিলে। বাংলা নববর্ষ ১৪২৫-এর শুভলগ্নে *ভারত বিচিত্রা*র সকল পাঠক পৃষ্ঠপোষককে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

কর্মযোগ

আইটেক এবং আইসিসিআর দিবস ২০১৮

১৯ মার্চ ২০১৮ ঢাকায় ভারতে পড়াশুনো করা সাবেক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আইসিসিআর ও আইটেক দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

১৯ মার্চ ২০১৮ বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর শাহবাগস্থ জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে এ দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৬৪ সালে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কৌশল কাঠামোর আওতায় ভারতের উন্নয়ন সহযোগিতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আইটেক কর্মসূচি প্রচলিত হয় যার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং যথাযথ প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতি বছর হিসাব, নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা, এসএমই, গ্রামীণ উন্নয়ন, সংসদীয় বিষয়াবলীর মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ১৬১টি সহযোগী দেশে ১০,০০০ এর বেশি প্রশিক্ষণ পর্বের আয়োজন করা হয়।

২০০৭ সাল থেকে আইটেক কর্মসূচির অধীনে ৩,৫০০ এর বেশি বাংলাদেশী তরুণ পেশাজীবী ভারতে এ ধরনের বিশেষায়িত স্বল্প ও মধ্যম পর্যায়ের কোর্স সম্পন্ন করেছে।

ভারত সরকার ১৯৭২ সাল থেকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদ (আইসিসিআর) এর মাধ্যমে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া স্নাতক থেকে পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে সকল বিষয়ে আইসিসিআর বৃত্তি দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ভারতে অধ্যয়নের জন্য ৩,২০০ এর বেশি মেধাবী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিশিষ্ট অতিথিবর্গের পাশাপাশি আইটেক এবং আইসিসিআর এর বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৭০০ প্রাক্তন শিক্ষার্থী আইটেক এবং আইসিসিআর দিবসে অংশগ্রহণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে প্রাক্তন আইসিসিআর শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন দেবলীনা সুর, ভরতনাট্যম পরিবেশন করেন অর্থি আহমেদ এবং কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন ওয়াফি রহমান অনন্যা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম তাঁর বক্তৃতায় আইটেক ও আইসিসিআর বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এদেশের জন্মলগ্ন থেকে আমাদের নিকটতম বন্ধু ও প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত যে অবদান রেখে চলেছে তা এক কথায় নজিরবিহীন।

হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ভারত সব সময়েই বাংলাদেশের পাশে থেকে এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

০৭ মার্চ ২০১৮ অসমের গুয়াহাটি রাজভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীর মত বিনিময় ॥ পরদিন অর্থাৎ ০৮ মার্চ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা অসমের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। হাই কমিশনার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির অসম সফরের প্রস্তুতি এবং দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করেন

০২ মার্চ ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ভারতীয় হাই কমিশনের সদস্য ও প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ হোলি উৎসব উদ্‌যাপন করেন। সকলের উপস্থিতিতে অনেক আনন্দোচ্ছ্বাস ও হুলোড়ের মধ্য দিয়ে রঙের এ উৎসব পালিত হয়

উপরে বামে: ১ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ, ভারত ও রাশিয়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে সহযোগিতার জন্য এক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রাশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত এবং রোসাটম-এর ডেপুটি মহাপরিচালক উপস্থিত ছিলেন
উপরে ডানে: ৫ মার্চ ২০১৮ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ফিন্যান্সিয়াল সিস্টেম রিস্ক অ্যাডভাইসরি কমিটির দক্ষিণ এশীয় সভাপতি শ্রী নেহচাল সান্ধু, রিচার্ড বুশার, এফএসআরএসি-র তিন বিশিষ্ট সদস্য ও এইচএসবিসি বাংলাদেশ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে ভারতীয় হাই কমিশনে অভ্যর্থনা জানান

নিচে বামে: ৩ মার্চ ২০১৮ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (আইইউবি), ঢাকার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাধনা আয়োজিত ভরতনাট্যম উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন ভারতের কর্ণাটকের গুরু কীর্তি রামগোপাল ও সঙ্গতকারীবৃন্দ
নিচে ডানে: বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের ভূমিকা স্মরণে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেইশিপ সোসাইটি আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

উপরে বামে: হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারতীয় নারী ফুটবল লিগের খেলায় অংশগ্রহণের জন্য ভারত গমনেচ্ছু বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের দুই উজ্জ্বল তারকা সাবিনা খাতুন ও কৃষ্ণা রানি সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন
উপরে ডানে: ভারত সফররত ২৫জন বাংলাদেশী সাংবাদিকের একটি দল কলকাতায় বিএসএফ দক্ষিণ বাংলা সীমান্ত ডিআইজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দলটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চল ঘুরে দেখেন

নিচে বামে: ১২ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশের ৪৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভারত-বাংলাদেশ সেনাবাহিনির ২য় সাইকেল অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি এবং রংপুর এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মো. মাশুদ রাজ্জাক। ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির উদ্বোধনের পর ১৫জনের এ দলটি যশোর হয়ে কলকাতা, বর্ধমান, মালদহ, হিলি, রানিগঞ্জ, বিনাগুড়ি, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং কোচ বিহার, চ্যাংড়াবান্দার ১২০০ কিমি পথ অতিক্রমকালে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন করেন
নিচে মাঝে: ২০ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশে মৈত্রী সাইকেল যাত্রা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনার সাইক্লিস্ট শ্রী ভোলানাথ দে-কে হাই কমিশনারের অভিনন্দন
নিচে ডানে: হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও ডিন শ্রী ছত্রপতি শিবাজি ও কান্ট্রি ডিরেক্টর শ্রী মনমোহন প্রকাশকে স্বাগত জানান

ঢাকা সফরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীসকাশে ভারতের বিদেশ সচিব শ্রী বিজয় গোখলে

সম্পর্ক

ভারত-বাংলাদেশ আলোচনায় বিদেশ সচিবের বক্তৃতা

ভারতীয় বিদেশ সচিব বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরকালে (৮-১০ এপ্রিল ২০১৮) 'ভারত-বাংলাদেশ: সহায়তা জোরদার ও ভবিষ্যৎ' বিষয়ক বক্তব্য প্রদান করেন। বিদেশ সচিবের বক্তব্যের উদ্ধৃতাংশ নিচে দেওয়া হল:

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী, বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবধন শ্রিংলা, প্যানেল আলোচকবৃন্দ, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়বৃন্দ–

আলোচনার সূচনায় 'ইনস্টিটিউট ফর পলিসি এডভোকেসি গ্রুপ'-এর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই আমাকে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় আলোচনা-দ্বিতীয় অধ্যায় 'গভীরতম সম্পর্ক ও সামনের পথ' শীর্ষক আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। যখন আমাদের অবিরাম ভাবতে হয়, 'তারপর কী?', তখন আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের এ পর্যায়ে এ ধরনের আলোচনার আয়োজন করার জন্য আয়োজকদের প্রশংসা করতেই হয়।

আমাদের দুই দেশ এতসব গুণপনার অংশীদার– অভিন্ন ইতিহাস, সীমানা, ভাষা, সংস্কৃতি, পারিবারিক ও আত্মীয়তা এবং সর্বোপরি সভ্যতার বন্ধন, ফলে বিশেষ সম্পর্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক। যে কেউই বলবেন, আজকের ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

এটি ব্যাপকভাবে এবং সত্যিকার অর্থে বলা যায় যে, আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এখন সর্বোত্তম, যাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন সোনালী অধ্যায় বা স্বর্ণযুগ।

কোন এক পক্ষের বা দু'পক্ষের রাজনৈতিক ইচ্ছা ব্যতিরেকে দেশগুলোর মধ্যে বিশেষত প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক কখনও ভাল হতে পারে না। আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমাদের উভয়পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাদের জনগণ, আমাদের দেশ ও আমাদের অঞ্চলের উপকারার্থে আমাদের সম্পর্ককে নবতর উচ্চতায় নিয়ে যেতে সদা প্রস্তুত। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমন প্রকাশ্যে বলেন, 'ভারত আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং প্রধান উন্নয়ন অংশীদার', তেমনি গত বছর বাংলাদেশ সফরকালে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ যথার্থই বলেছেন, 'প্রতিবেশী আগে, তবে সবার আগে বাংলাদেশ।' এখন কি আমরা বলতে পারি, আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়নে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে আর স্পষ্ট কি চাই?

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এক দশক আগে কেমন ছিল আর আজ কেমন, এর জবাবে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের সংখ্যা একটা প্রচলিত মাপকাঠি হতে পারে। ২০১০ সাল থেকে ১০০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬৮টি হয়েছে গত তিন বছরে– ২০১৫ ও ২০১৭-য় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত ও বাংলাদেশ সফরকালে, এসব চুক্তির অধিকাংশই পূর্ববর্তী চুক্তির নবায়ন নয়, বরং মহাকাশ, বেসামরিক পারমাণবিক শক্তি, আইটি ও ইলেকট্রনিক্স, সাইবার নিরাপত্তা, ব্লু ইকোনমি (সামুদ্র অর্থনীতি) ইত্যাদির মত নতুন উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রবর্তনাবিষয়ক।

নবতর ও অপ্রচলিত ক্ষেত্রে সহযোগিতার এই উদ্যোগ আমাদের পরিণত অংশীদারিত্বের প্রতীক। আজ আমরা নুমালিগড় ও পার্বতীপুরের মধ্যে মৈত্রী পাইপলাইন, প্রসারভারতী ও বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে সহোযোগিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আইসিসিআর উর্দু চেয়ার স্থাপন এবং জিসিএনইপি-বিএইসি (গ্লোবাল সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার এনার্জি পার্টনারশিপ-বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন) আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকসহ আরো ৬টি দলিলে স্বাক্ষর করছি।

ব্যাপক ও গুণগত প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা চুক্তির বাস্তবায়ন আমাদের সম্পর্কের উন্নয়নের সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ। ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশ স্বেচ্ছায় ৬ দশকের অমীমাংসিত স্থল সীমানার বিষয়টির নিষ্পত্তি করেছে। ভারতীয় সংসদ ২০১৫ সালের মে মাসে '১৯৭৪ সালের ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমানা চুক্তি' এবং ২০১১ সালে এর প্রোটোকল বাস্তবায়নে সাংবিধানিক সংশোধন বিলটি সর্বসম্মতভাবে পাশ করে। প্রথমবারের মত, ছিটমহলের বাসিন্দারা নাগরিক অধিকার লাভ করেন। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ধরন বিবেচনা করে সংসদে সর্বসম্মতভাবে স্থল সীমানা চুক্তি বিল পাশ ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের প্রতিফলন। ২০১৪ সালে সালিসির মাধ্যমে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণকেও আমাদের দুই দেশের নেতৃত্ব 'উইন-উইন' ফলাফল হিসেবে অভিনন্দিত করেছেন। স্থল ও সমুদ্র সীমানা নির্ধারণ নিষ্পত্তি আমাদের অংশীদারিত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে সীমাহীন গতি সঞ্চার করেছে।

আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অনেকানেক ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি অর্জন করলেও এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা আমাদের একযোগে মোকাবেলা করতে হবে। এ রকম একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা ও মৌলবাদ, যার মোকাবেলা করতে আমরা দুই দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সন্ত্রাসবাদের প্রতি 'জিরো টলারেন্স' নীতি এবং সব পর্যায়ে সন্ত্রাস ও চরমপন্থার হিংস্রতা মোকাবেলায় ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে ঘৃণা, সহিংসতা ও সন্ত্রাস থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দুই দেশের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্কিত সব বিষয়ে সহযোগিতা খুবই চমৎকার। ভারতের যে-কোন প্রতিবেশীর চেয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে চার হাজার কিলোমিটারের অধিক স্থল সীমানা ভাগ করার বিবেচনায় এটি খুবই উল্লেখযোগ্য অর্জন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর শান্তি-শৃঙ্খলা রজায় রাখা এবং আন্তঃসীমান্ত অবৈধ কর্মকাণ্ড ও অপরাধ দমনে আমাদের দুই দেশের সীমান্ত রক্ষাবাহিনির প্রচেষ্টার সমন্বয়ে 'সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থা পরিকল্পনা' সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের দুই দেশের সীমান্ত রক্ষাবাহিনির সক্রিয় প্রচেষ্টার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমান্তে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। বিএসএফ এবং বিজিবির সীমান্ত জুড়ে 'অপরাধমুক্ত এলাকা' ঘোষণার সাম্প্রতিক পদক্ষেপ একটি শুভেচ্ছা বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্যোগ যা আমাদের 'অপরাধমুক্ত সীমান্ত'-র অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

আজকের দিনে দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ককে রাজনীতির চেয়ে বরং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটে দেখা হয়। আজ আমরা সন্তোষের সঙ্গে বলতে পারি যে, আমরা একইভাবে এক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছি। গত ১০ বছরে আমাদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০০৮-'০৯-এর ২৭৫ কোটি মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০১৬-১৭-য় ৭৫২ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আজ ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। মাত্র ২৫টি পণ্য ছাড়া সকল বাংলাদেশী রফতানির ওপর শুল্কবিহীন প্রবেশাধিকার দিয়ে ভারত তার বাজার উন্মুক্ত করেছে। একইভাবে ভারতের নেতৃস্থানীয় সরকারি-বেসরকারি কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে এবং আরো বহু উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ প্রস্তাব আলোচনাধীন। বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে। ভারতে অল্প কিছু বাংলাদেশী কোম্পানির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের পতাকাবাহী কর্মসূচী 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র অধীনে ভারতের বিরাট নিজস্ব বাজারের সুযোগ নিয়ে আপনাদের কোম্পানিগুলোকে ভারতে আরো আরো বিনিয়োগ করতে আমরা উৎসাহ দিই।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্র, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' (বা সবার জন্য উন্নয়ন)-এর বিরাট প্রভাব পড়েছে। ভারত বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের এক অঙ্গীকারাবদ্ধ উন্নয়ন অংশীদার। গত কয়েক বছরে আপনাদের উন্নয়নে সহায়তা করতে আমরা সম্ভাব্য সহজ শর্তে বাংলাদেশকে ৮শো কোটি মার্কিন ডলার দিয়েছি। কোন একক দেশকে এটিই ভারতের সর্বোচ্চ ঋণ। ঋণরেখা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক। প্রথম ঋণরেখার অধিকাংশ প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋণরেখায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষ করে রেলওয়ে খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ঋণরেখায় আইটি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারি পরিবহন, অর্থনৈতিক জোন ইত্যাদি গুরুত্ব পায়। তৃতীয় ঋণরেখায় বন্দর, বিমানবন্দর, রেলওয়ে, টেলিযোগযোগ, জাহাজ চলাচল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবকাঠামোগত প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি জোর দিতে চাই যে, ভারতীয় ঋণরেখা পরিচালন নীতির অংশ হিসেবে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকার অনুসারে বাংলাদেশ প্রকল্পসমূহ নির্বাচন করে। আমাদের লক্ষ্য এসব প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা যাতে জনগণ যত দ্রুত সম্ভব এর উপকারিতা ভোগ করতে পারে। গত নভেম্বরে আমাদের দুই প্রধানমন্ত্রী ঋণরেখার অধীনে বাংলাদেশে দুটি প্রধান অবকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন– দ্বিতীয় ভৈরব রেলসেতু এবং দ্বিতীয় তিতাস রেলসেতু। এ ধরনের আরো প্রকল্পের শিগগিরই উদ্বোধন হবে। আমরা বাংলাদেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সম্প্রদায়ভিত্তিক কল্যাণ, সড়ক অবকাঠামোসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রকল্প হাতে নিয়েছি যার জন্য মঞ্জুরি সহায়তার আওতায় ১৬শো কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা আজ আরও দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি যেখানে বাংলাদেশের ৫০০ স্কুলে ভাষা ল্যাব প্রতিষ্ঠা এবং রংপুর শহরের বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার করব।

আমাদের উন্নয়ন অংশীদারিত্বের লক্ষণীয় দিক হচ্ছে বাংলাদেশের প্রয়োজন মোকাবেলায় সামর্থ্য তৈরি কর্মসূচী ও সে-অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ। আমরা বাংলাদেশীদের জন্য প্রত্যেক বছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেড় হাজারের অধিক প্রশিক্ষণগুচ্ছ/বৃত্তি দিচ্ছি এবং প্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিচালিত কর্মসূচীর জন্য ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। আমাকে বলা হয়েছে, ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (আইটিইসি বা আইটেক) ও ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর)-এর অধীনের বৃত্তিগুলো খুবই দরকারী বলে বিবেচিত হচ্ছে। আমরা এসব কর্মসূচী ও বৃত্তি অব্যাহত রাখতে চাই এবং

> আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে আমাদের উভয় দেশের জন্য 'উইন-উইন' সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে-কারণেই আমাদের উভয় দেশ আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে গতিবেগ সঞ্চারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরো প্রশিক্ষণগুচ্ছ/বৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারলে আনন্দিত হব। আমাদের সাম্প্রতিক উদ্যোগ হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করা, যে-জন্য আমরা খুলনা ও যশোরে নুতন যন্ত্র তৈরি ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত করার কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সঙ্গে যোগাযোগের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, পরিবহন, টেলি-যোগাযোগ, সাইবার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয় জোরদার করা সম্ভব। এর মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এবং এ উপ-অঞ্চলে বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন হবে। আমরা সড়ক, রেল, বিমান, নৌ ও উপকূলীয় জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে সংযোগ বাড়াতে সক্ষম হয়েছি। সড়ক, রেল, নৌ ও উপকূলীয় জাহাজ চলাচল ক্ষেত্রে ১৯৬৫-পূর্ব সংযোগ পুনঃস্থাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন আমাদের চালিকাশক্তি।

গত নভেম্বরে দুই প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে কলকাতা ও খুলনার মধ্যে একটি নতুন যাত্রীবাহী ট্রেন সার্ভিস 'বন্ধন এক্সপ্রেস'-এর উদ্বোধন করেছেন এবং কলকাতা-ঢাকা রুটে মৈত্রী এক্সপ্রেসের যাত্রীদের জন্য দুই প্রান্তে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস্ সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করেছেন। রাধিকাপুর (ভারত) ও বিরল (বাংলাদেশ)-এর মধ্যে রেল সংযোগ পুনস্থাপনের মধ্য দিয়ে আমরা ১৯৬৫-পূর্ব দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান ৬টি সংযোগের ৪টি পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। ভারতীয় মঞ্জুরি সহায়তায় আগরতলা ও আখাউড়ার মধ্যে ৭ম নতুন রেল সংযোগ স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

গত বছরের আগস্ট মাসে উভয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থল বন্দর পেট্রাপোল-বেনাপোল স্থল বন্দর সাতদিন-চব্বিশ ঘণ্টা (২৪x৭) চালু রাখার ঘোষণায় দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কলকাতা-ঢাকা, সিলিগুড়ি-ঢাকা এবং ঢাকা হয়ে আগরতলা-কলকাতার মধ্যে নিয়মিত বাস সার্ভিস চলছে। ২০১৭-র এপ্রিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে একটি নতুন বাস সার্ভিস (ঢাকা-খুলনা-কলকাতা) চালু হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল– মোটর ভেহিকল এগ্রিমেন্ট (বিবিআইএন-এমডিএ)-এ সড়ক পথে যোগাযোগ লক্ষণীয়ভাবে বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। ফেনী নদীর ওপর প্রস্তাবিত সেতু ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হয়ে উঠবে। সাম্প্রতিক বছরে বিমান যোগাযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এখন সপ্তাহে ১০০টির বেশি ফ্লাইট চালু আছে।

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্যতম দ্রষ্টব্যে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে। ২০১৮ সাল থেকে আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে দুই প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রফতানি এবং বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ্ রফতানির উদ্বোধন করেন। রামপালে ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (এনটিপিসি) এবং বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিপিডিবি)-এর মধ্যে ৫০ : ৫০ যৌথ উদ্যোগে কয়লাভিত্তিক মৈত্রী থারমাল পাওয়ার প্লান্ট তৈরি হচ্ছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১৩২০ মেগাওয়াট । ২০১৭-র এপ্রিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে ভারতীয় সরকারি-বেসরকারি কোম্পানি ও বাংলাদেশ পক্ষের মধ্যে ৩৬০০ মেগাওয়াটের চেয়ে বেশি বিদ্যুতের উৎপাদন/সরবরাহ/অর্থায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত থেকে আরো বিদ্যুৎ সরবরাহের অনেক প্রস্তাব উভয়পক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

গত দু'বছরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জ্বালানি খাতে সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশের তেল ও গ্যাসখাতে নেতৃস্থানীয় ভারতীয় কোম্পানিগুলো তাদের বাংলাদেশী সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করছেন। ভারতীয় মঞ্জুরি অর্থায়নে শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুর পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন নির্মাণের জন্য আজ আমরা একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছি, যার ফলে নুমালিগড় তৈল শোধনাগার থেকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন ডিজেল সরবরাহ সম্ভব হবে।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষে-মানুষে যোগাযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে এই সম্পর্কের চালিকাশক্তি বলা যেতে পারে। প্রকৃতিগত অভিন্ন ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে উভয় দেশের মানুষ সাংস্কৃতিকভাবে আরো একতাবদ্ধ। সম্পর্কের এই দিকটি জোরদার ও গতিশীল করতে আমরা নানা উদ্যোগ নিয়েছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, বাংলাদেশীরা আজ ভারত ভ্রমণেচ্ছুদের সংখ্যার বৃহত্তম অংশটি গঠন করেছেন– বাংলাদেশে আমাদের হাই কমিশন ২০১৭ সালে ১৪ লাখ ভিসা ইস্যু করে। ২০১৫-র তুলনায় এ সংখ্যা দ্বিগুণ। মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরসূরীরা আমাদের হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। গত বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৫ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা এবং ভারতীয় হাসপাতালে ১০০ মুক্তিযোদ্ধার বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ একাধিক উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন। ৬৫ বছরের অধিক বয়সের প্রবীণ নাগরিকদের ইতোমধ্যে ৫ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা দেওয়া হচ্ছে।

গত বছরের আগস্ট মাস থেকে গত কয়েক মাসে মায়ানমারের রাখাইন অঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত বিপুলসংখ্যক মানুষের ঢল আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লাখ লাখ বিপন্ন মানুষের সহায়তায় বাংলাদেশের মানবিক সৌজন্য সত্যিই প্রশংসনীয়। এসব বাস্তুচ্যুত মানুষের দ্রুত প্রত্যাবর্তনসহ এ সংকট মোকাবেলার চলমান প্রচেষ্টায় ভারতের পূর্ণ সমর্থন আছে। আমরা গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সরকারকে তার এ মানবিক প্রচেষ্টায় সমর্থন করতে 'অপারেশন ইনসানিয়াত' নামে ৩ লাখ মানুষের জন্য ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছিলাম। বাংলাদেশ সরকারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা ত্রাণ সহায়তায় দ্বিতীয় চালান পাঠাবার পরিকল্পনা করছি। প্রত্যাগত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পূর্ব-নির্মিত গৃহ নির্মাণসহ আমাদের 'রাখাইন রাজ্য উন্নয়ন কর্মসূচী'র অধীনে মায়ানমারকে সামাজিক-অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করছি।

আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে আমাদের উভয় দেশের জন্য 'উইন-উইন' সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সে-কারণেই আমাদের উভয় দেশ আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে গতিবেগ সঞ্চারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। ভারত ও বাংলাদেশ আজ রেকর্ডসংখ্যক দ্বিপক্ষীয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে যা সহযোগিতার সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করছে। অভিন্ন স্বার্থ রক্ষায় সহযোগিতায় বর্তমান ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। যে-সব ক্ষেত্রের কথা আমি উল্লেখ করলাম, আমাদের জনগণ ও অঞ্চলের স্বার্থে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা গভীরতর ও শক্তিশালী করতে হবে। আমি আমাদের সম্পর্কের ইতিবাচকতার ওপর খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি, সম্ভবত আপনারাও একমত হবেন যে, আমাদের মধ্যে যে সামান্য ক'টি বিষয় অমীমাংসিতও আছে, তার যথাসম্ভব সমাধানে আমরা উভয়পক্ষ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সংলাপকালে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্যমান সম্পর্কের সকল দিক উঠে আসবে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার নতুন মাত্রা ইতোমধ্যে স্থায়ী দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতার নিরিখে পুনর্সংজ্ঞায়িত হচ্ছে যা অন্যান্য দেশ মূল্যায়ন করতে পারে। আমরা আগামী দিনগুলোতে আমাদের সম্পর্ককে কিভাবে নতুন স্তরে উন্নীত করব, সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের শিক্ষা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় হবে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা! জয় হিন্দ!!

অনুবাদ
মানসী চৌধুরী

সৌহার্দ // ১

মোদি দর্শন, সুষমার আন্তরিকতা এবং আমার সোনার বাংলা

মিথুন আশরাফ

অপেক্ষার প্রহর যেন শেষই হতে চায় না। কখন আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এ যেন আকাশের 'চাঁদ' হাতে পাওয়া হবে। শেষপর্যন্ত সেই 'চাঁদ' মিলল। দর্শন মিলল বিশ্বের সেরা ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রীদের অন্যতম শ্রী নরেন্দ্র মোদির। দেখা হতেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আবার যা বললেন, তাতে মুগ্ধতাই শুধু ছড়াল। বললেন, 'আমার সোনার বাংলা'। এমনভাবে মায়াভরা কণ্ঠে তিনি কথাগুলো বললেন, যেন প্রাণপ্রিয় তরুণদের কাছে পেয়েছেন। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত সফরে যাওয়া বাংলাদেশের একশো তরুণ প্রতিনিধির সবাই অভিভূত। তাঁর দর্শন পাওয়া এবং তাঁর কণ্ঠে শোনা, 'আমার সোনার বাংলা' যেন মনের গভীরে চিরদিন স্থান করে নিল।

মোদির মুখে 'বাংলা' শুনে মন জুড়িয়ে যাওয়ার আগেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের বন্ধুত্বপূর্ণ বক্তব্য সবাইকে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর আন্তরিকতা, আতিথেয়তা যেন ভোলার নয়। তিনি যে বলেছেন, 'ভবিষ্যতে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার দায়িত্ব তরুণদের। তোমাদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বাংলাদেশ পরিণত হবে স্বপ্নের সোনার বাংলায়।' তাঁর বক্তব্যে বন্ধুত্ব মিলেছে। বাংলাদেশের একজন কাছের বন্ধু তিনি, তা বোঝার আর বাকি থাকেনি। তাঁর বক্তব্যগুলো তরুণদের আত্মবিশ্বাসীও করে তুলেছে।

ছয়বার ধরে, ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছরই বাংলাদেশ থেকে একশো তরুণের একটি প্রতিনিধিদল ভারত সফরে যায়। বাংলাদেশের ভারতীয় হাই কমিশন এই তরুণদের সারা দেশ থেকে বাছাই করে। অনেক প্রক্রিয়ার পর ইন্টারভিউ হয়। শেষপর্যন্ত বিশেষক্ষেত্রে পারদর্শী একশো তরুণকে বাছাই করা হয়। এরপর ভারত সফর হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এবার একশো তরুণ যা পেল, তা এর আগে কখনোই অন্যরা পায়নি। সেটি হচ্ছে, প্রথমবারের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দর্শন পাওয়া। তাও আবার শ্রী নরেন্দ্র মোদির মত ক্ষমতাধর, বুদ্ধিমান, বৈশ্বিক সম্পর্ক তৈরি করায় খ্যাতিমান একজনের সঙ্গে দেখা হওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার! সেই ভাগ্য এবার একশো তরুণের হয়েছে। মোদির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফটো তোলার সুযোগ হয়েছে, যা সারাজীবনের পুঁজি হয়ে থাকছে। তাঁর কণ্ঠে বাংলা কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। একটা সময় প্রধানমন্ত্রী ভবনটিকে যেন মনে হয়েছিল 'মিনি বাংলাদেশ'। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এমনই কাছে টেনে নিয়েছেন তরুণদের, যেন তারা খুব আপনজন, খুব কাছের মানুষ, আত্মার আত্মীয়।

আত্মীয় মনে হয়েছে বিদেশমন্ত্রীকেও। তিনি প্রতিটি বক্তব্যেই বাংলাদেশের জন্য শুভ কামনা জুড়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন দৃশ্যমান। দুই দেশের সম্পর্ককে জোরদার করতে বাড়ানো হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসর। ২০১৭ সালে ১৪ লাখ বাংলাদেশী ভারতের ভিসা পেয়েছেন। আইসিসিআর ভারতের একটি আকর্ষণীয় শিক্ষা কর্মসূচি। বিশ্বের ৭০টি দেশের নাগরিক ভারতের এই শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে থাকে।' সঙ্গে যোগ করেন, 'আমরা খুবই আনন্দিত যে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা মেধার মাধ্যমে আইসিসিআর প্রোগ্রামে অনেক জায়গা করে নিচ্ছে।'

এবার ভারত সফর শুরু হয় ২৪ মার্চ, শেষ হয় ৩১ মার্চ– ১ এপ্রিল সকালে দেশে ফিরে আসা। এ সফরে আমন্ত্রিত তরুণদের একেক জন একেক স্থানের, একেক পেশার। এ সফরে ছিলেন দেশের গণমাধ্যম কর্মী, চিকিৎসক, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, খেলোয়াড়, আম্পায়ার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিল্পী, চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, মডেল, ব্যবসায়ী, বেসরকারি চাকরিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। আটদিনের ভারত সফরে সবাই যেন একটি 'পরিবার' হয়ে ওঠে, একটি 'বাংলাদেশ' হয়ে ওঠে, বাংলাদেশের প্রতীক হয়ে ওঠে।

এ সফরে ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়, দুই দেশের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি হয়। ২৫টিরও বেশি ঐতিহ্যবাহী স্থান ঘুরে দেখা হয়। অনেক কিছু শেখার, জ্ঞান আহরণের, স্বাবলম্বী হওয়ার, নতুন বন্ধু তৈরি করার, আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার সুযোগ হয়। ভারত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণাও মেলে। ধন্যবাদ ভারতীয় হাই কমিশনকে, ধন্যবাদ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রীংলাকে। ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনের নিয়ন্ত্রণে প্রতি বছর দেশের একশো তরুণ বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে ভারত সফরের সুযোগ পেয়ে থাকে। এবার সেই একশোজনের একজন ছিলাম আমি মিথুন আশরাফ, কাজ করি দৈনিক জনকণ্ঠে সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার (স্পোর্টস) হিসেবে। বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি (বিএসপিএ)-কেও ধন্যবাদ না দিলেই নয়। এ সংস্থাটিই আমাকে দেশের প্রতিনিধি হয়ে ভারত সফরের জন্য নির্বাচিত করে, প্রতিনিধি হয়ে ভারত সফর করার সুযোগ করে দেয়। এ সংস্থাটির যুগ্ম-সম্পাদকও আমি। এরপর ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনে 'ফ্ল্যাগ অফ সেরেমনি' প্রোগ্রামের পর আটদিনের ভারত সফরও হয়ে গেল। দিল্লি হয়ে আগ্রা, মুম্বই, পুনের বিশেষ স্থানগুলো ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে। একশো তরুণের সঙ্গে গভীরভাবে মেশার সুযোগ হয়েছে, অনেক কিছু শেখার, বোঝার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির দর্শন এখনও চোখে ভাসে। আর তাঁর বলা, 'আমার সোনার বাংলা' এখনও আনমনে গুনগুন করতে থাকি। সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের বন্ধুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলো প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছে।

শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হয় ২৭ মার্চ। 'কেমন আছ, আমার সোনার বাংলা'– ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি যখন শুরুতেই কথাগুলো বললেন, মনটা জুড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতিনিধি হয়ে ভারত সফর করা একশো তরুণের কণ্ঠে বেজে উঠল জাতীয় সংগীতের সুর, 'আমি তোমায় ভালবাসি।' প্রধানমন্ত্রী ভবনের যে ঘরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হল, সেই ঘরটি যেন ভালবাসার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।

তাঁর সঙ্গে কাটানো কিছু সময় যেন চিরদিনের জন্য মনের কুঠুরিতে জায়গা করে নিল, অপলক তাঁর দিকে শুধু তাকিয়েই থাকতে মন চাইল, তাঁর কথাগুলো যেন মনকে ছুঁয়ে গেল।

এই আটদিনের ভারত সফরের প্রতিটি দিনই মনে থাকবার মত। নতুন বন্ধু তৈরি হয়েছে, আনন্দ হয়েছে, সুখী একটি পরিবারের মত মনে হয়েছে। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিশেষ পরিচয় আছে, নিজের আঙ্গিনায় প্রত্যেকেই সেরা, প্রত্যেকেই প্রতিভাবান, প্রত্যেকেই নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেছেন, সবার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়েছেন, একসঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করেছেন, সবার সঙ্গে মিশে জ্ঞান নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রতিটি দিনই খুব সূচি মেনে চলতে হয়েছে। দিল্লি, আগ্রা, পুনে, মুম্বইয়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ঘুরতে গিয়ে কখনো সূচির এদিক-ওদিক হয়েছে। তবে যে সূচি ছিল, তার বেশিরভাগই ঘুরে দেখা গেছে। প্রতিদিনই চার-পাঁচটি করে স্থান ঘোরা হয়েছে। আর সবসময়ই এই একশো তরুণের সঙ্গে অভিভাবক হয়ে ছিলেন বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম রাজনৈতিক সচিব রাজেশ উইকে এবং সফরের সমন্বয়ক ভারতীয় হাই কমিশনের মিডিয়া ও কালচার কো-অর্ডিনেটর কল্যাণকান্তি দাশ। সঙ্গে ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা 'রসিকতার ভাণ্ডার' মদনমোহন এবং সদা হাস্যোজ্জ্বল পুনমজী।

চব্বিশে মার্চ শুরু হয় ভারত ভ্রমণ। ঢাকা থেকে দিল্লি গিয়েই শুরু হয়ে যায় ব্যস্ত সফর। দুপুরের খাবার খেয়েই শুরুতে ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর আর্টসের (আইজিএনসিএ) সৌন্দর্য উপভোগ করি। এখানে অত্যন্ত চমৎকারভাবে ভারতের সংস্কৃতি ধরে রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। এরপর সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া গেট ঘুরে দেখা। এখানে ১৯১৪-'২১ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নিহত ৭০ হাজার ভারতীয় সৈন্যের স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে। 'ইন্ডিয়া গেট' দর্শনশেষে হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া।

পরের দিন ২৫ মার্চ তাজমহল ও আগ্রা ফোর্ট ঘুরিয়ে দেখানো হয়। আগ্রার তাজমহল ভালবাসার চূড়ান্ত নিদর্শন। সম্রাট সাহাবুদ্দিন মুহম্মদ শাহজাহান ১৬৩১ সালে দ্বিতীয় সহধর্মিণী আর্জুমান্দ বানু বেগম মমতাজের প্রতি তাঁর ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে তাজমহল তৈরি করেন। তাজমহলের ভেতরেই মমতাজের কবর রয়েছে। তার পাশেই শাহজাহানকে কবর দেওয়া হয়। তাজমহল পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করার পর আগ্রা ফোর্টে যাই।

মুঘল রাজবংশের প্রতীক এ দুর্গ থেকে তাজমহলও দেখা যায়। এ দুর্গেই আওরঙ্গজেব তার বাবা শাহজাহানকে শ্বেতপাথরের ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন। এ ঘর থেকেই তাজমহল দেখে মুগ্ধ হতেন শাহজাহান। সত্যিই চোখকে জুড়িয়ে যায়! শেষে মৌসাম্মান বুর্জ নামে ঘরটিতেই মৃত্যুবরণ করেন শাহজাহান। তাজমহল ও আগ্রা ফোর্ট ঘুরে আবার হোটেলে ফেরা, চোখের পলকে যেন দিনটি শেষ হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ। এই দিনটি শুরুই হয় কেক কেটে। হোটেলে একশো তরুণ কেক কাটার সময় উপস্থিত ছিলেন। ভারতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়া একশো তরুণের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন– সবার কণ্ঠে বেজে ওঠে জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি...।'

দিনের শুরুতেই স্বাধীনতা দিবস পালনের পর প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্রে একশো তরুণকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিভাবে দেশের তরুণরা উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও স্কিলে উন্নতি করতে পারে, পরবর্তী সময়ে নিজের যোগ্যতায় জীবন কাটাতে পারে, এখানে তাই দেখানো হয়, যা খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক উদ্যোগ।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র ঘুরে লেডি শ্রীরাম কলেজ ফর উইমেনে গিয়ে জানা যায় দিল্লির মহিলা কলেজ এটি, যেটি কিনা আর্টস এন্ড এ্যাডুকেশনের দিক দিয়ে এক নম্বর, কমার্সের দিক দিয়ে ২ নম্বর এবং গণ যোগাযোগ শিক্ষায় ভারতের তিন নম্বর স্থান দখল করে আছে। ১৯৫৬ সালে লালা শ্রীরামের তৈরি করা এ কলেজটি ২০১৪ সালে সেরা আর্টস কলেজে ভূষিত হয়। এখন কলেজটি লালা শ্রীরামের স্ত্রী ফুলন দেবীর তত্ত্বাবধানে আছে। তাঁকে 'লেডি শ্রীরাম'ও বলা হয়।

এই কলেজ ঘুরে দিল্লি হাট হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হন সবাই। সেখানে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সান্নিধ্য মেলে। সুষমা স্বরাজের সঙ্গে ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এ কে দুবে। সুষমা বক্তব্য রাখেন। মনোমুগ্ধকর বক্তব্যে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের তরুণরা এই সফরের মাধ্যমে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।' সুষমার বক্তব্যেই স্পষ্ট, বাংলাদেশকে ভারত কতটা বন্ধু মনে করে।

সুষমা স্বরাজের প্রোগ্রাম শেষে যুব মন্ত্রণালয়ের দেওয়া কালচারাল প্রোগ্রামে অংশ নেন একশো তরুণ। সেখানে সন্ধ্যা হয়ে রাতে আনন্দঘন মুহূর্তের তৈরি হয়। সবাই নেচে-গেয়ে স্মৃতিমধুর সময় কাটান, দুর্দান্ত সময় উপভোগ করেন– যা স্মৃতিতে গেঁথে আছে। পুরো সফরে এ সময়টাই যেন ছিল সবচেয়ে আনন্দময়। একটা সময় সবাই মিলে নাচতে থাকেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান সবাই। যখন মোবাইল থেকে বের করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এ কে দুবে মাইক্রোফোনে বাজান, 'আল্লাহ

মেঘ দে, পানি দে' গানটি, তখন সবাই তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে মুগ্ধ হয়ে যান। বাংলাদেশও যে তাঁর মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে, তা ভালভাবেই বোঝা যায়।

পরের দিন ২৭ মার্চ আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যে সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন প্রত্যেকটি তরুণ। ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর একশোজন তরুণ ভারত সফরের সুযোগ পান ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। কিন্তু এবারই প্রথমবারের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একশো তরুণ দেখা করার সুযোগ পেলেন। তাঁরা এমন এক প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেলেন, যিনি কিনা ভারতের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করছেন। এর আগে যাঁরাই এ আসন অলংকৃত করেছেন, তাঁদের সবাই ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি। তাঁর ভেতর যে আধুনিক যুগের ছোঁয়া কী পরিমাণে আছে, তা তাঁর কাজকর্মে পরিষ্কার। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয়– ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, ইন্সটাগ্রাম, সাউন্ড-ক্লাউড, লিঙ্কড-ইন, ওয়েবিও এবং আরও কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয়। যখন একশো তরুণ তাঁর সঙ্গে ফটোসেশন করে, কিছুক্ষণ পরেই প্রধানমন্ত্রীর অফিশিয়াল টুইটার পেজে ছবিসহ পোস্টও দেখা যায়। ফটোসেশন শেষে দশ মিনিট তরুণদের সঙ্গে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। সে এক অসাধারণ সময়। মুহূর্তেই কেটে গেল সময়। তার কথাই শুধু শুনতে মন চাইল। বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাই তাঁর কথাবার্তায় ফুটে উঠল। শ্রী মোদি জানতে চান, একশো তরুণ কোথায় ঘুরেছে, কোথায় ঘুরতে যাবে? দিল্লি হয়ে মুম্বই যাওয়া হবে শুনে বলে ওঠেন, 'বলিউড কা শাহার হ্যায়' (বলিউডের শহর)। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'দিল্লি ক্যায়সা লাগ রাহে' (দিল্লি কেমন লাগছে)। সবাই সমস্বরে বলে উঠেন, 'বহত আচ্ছা লাগ রাহাতে হ্যায়' (অনেক দারুণ লাগছে)। এরপর দিল্লি, কলকাতা সফরের অভিজ্ঞতা এর আগে আছে কিনা জানতে চান। যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তারা হাত উপরে তোলেন। কিন্তু এবার কলকাতা যাওয়া হচ্ছে না শুনে মোদি বলেন, 'বাংলাদেশ-কলকাতা সেম হেয়' (একই)। এরপর শ্রী মোদি বিদায় নেন। তরুণরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর নেতৃত্ব, আন্তরিকতা দেখে সবাই মুগ্ধ। যেন জাদু! জীবনের সেরা মুহূর্তও যেন মিলিয়ে গেল।

শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের পর যাওয়া হয় প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্রে। জানা হল, কিভাবে এ কেন্দ্র কাজ করে। ২০১৬ সালের ২রা অক্টোবর, ভারতের দুই মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিনে এ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'মহাত্মা গান্ধী জীবিকার সন্ধানে এদেশ ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী হয়েছিলেন। কিন্তু এই দেশের মাটির আহ্বানে তিনি দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জীবিকার সন্ধানে বিশ্বের নানা প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সফলকাম ব্যক্তিদের জন্য মহাত্মা গান্ধীর এই প্রত্যাবর্তনের চাইতে অধিক প্রেরণা আর কী হতে পারে?' তিনি আরও বলেছিলেন, 'বছরের পর বছর ধরে আমরা একটা কথা শুনে আসছি। আমাদের নবীন প্রজন্মের মেধাবী সন্তান-সন্ততিরা লেখাপড়া শিখে বিদেশে চলে যায়। শুনতে শুনতে 'ব্রেন ড্রেন, ব্রেন ড্রেন' এই শব্দ দুটি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া ভারতীয়দের আমরা যদি নিছকই সংখ্যারূপে না দেখে শক্তিরূপে দেখি তাহলে যে 'ব্রেন ড্রেন' এতদিন আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল সেটাকেই আমরা 'ব্রেন গেন'-এ রূপান্তরিত করতে পারব।'

নরেন্দ্র মোদি আরও বলেছিলেন, 'নদীতে অনেক জল প্রবাহিত হয়। কিন্তু কেউ যদি বাঁধ দিয়ে তা থেকে শক্তি উৎপাদন করতে পারে, তাহলে সেই জল শক্তির উৎসরূপে বিবেচিত হয়। তেমনি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের সঙ্গে নিরন্তর সম্পর্ক রক্ষা করে আমরা তাদের বুদ্ধি ও বৈভবকে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারি।' প্রবাসী কল্যাণ প্ল্যাটফরম গঠন করে এদেরকে উন্নয়নের কাজে লাগানোও হচ্ছে। এই পর্ব শেষেই দিনটি শেষ হয়।

পরের দিন ২৮ মার্চ দিল্লির শেষদিনে শুরুতেই গান্ধী মেমোরিয়ালে গিয়ে শুরুতে সমাধির সামনে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর গান্ধী মিউজিয়ামে গিয়ে ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারলাম অনেক অজানা তথ্য। এরপর হুমায়ুনের সমাধিসৌধে গিয়ে এর সৌন্দর্য অবলোকন করলাম। হুমায়ুনের পত্নী হামিদা বানু বেগম এই সমাধি ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। এটি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম উদ্যান-সমাধিক্ষেত্র। লাল বেলেপাথরের এতবড় মাপের স্থাপনাগুলির মধ্যে হুমায়ুনের সমাধিসৌধই ভারতে প্রথম।

দিল্লিতে গিয়ে কুতুবমিনার না দেখলে কী আর হয়? বিশ্বের সর্বোচ্চ পোড়ামাটির নির্মিত মিনার এটি। মিনারটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তবে মিনারের উপরের তলাগুলোর কাজ সম্পূর্ণ করেন ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এটি দিল্লির অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য।

কুতুবমিনার দেখা শেষে দিল্লি ভ্রমণ পর্ব শেষ হয়। এরপর বিকেলে বিমানে করে মুম্বই। রাতে নেমে বিমানবন্দরে পাওয়া গেল অসাধারণ সম্মান। মন্ত্রণালয়ের জনাকয়েক কর্তাব্যক্তি ফুল দিয়ে একশো তরুণকে বরণ করে নিলেন। এরপর হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম।

ষষ্ঠ দিন ২৯ মার্চ শুরুতেই নভি মুম্বইয়ের মিউনিসিপিলিটি পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে মুম্বইপর্বের সূচনা হল, যেটাকে এখন নতুন মুম্বই আখ্যা দেওয়া হয়। সেখানে মেয়রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল। জানা গেল তাঁদের কার্যক্রম সম্পর্কেও। নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং শহরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মুম্বইকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি মুম্বই। আরেকটি নভি মুম্বই। নভি মুম্বই খারগড় থেকে উরান পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মেয়র শ্রী জয়ন্ত দত্তাত্রে সুতার। সুতারবাবুর বাংলাদেশে আসার খুব শখ। নগর পরিকল্পনার সার্বিক দিকগুলো দেখানোর পর জয়ন্ত সাংবাদিকদের বলেন, 'বাংলাদেশে যাওয়ার নিমন্ত্রণ এর আগে কয়েকবার পেয়েছি। কিন্তু কখনোই যেতে পারিনি। আমার সবকিছু নভি মুম্বইকে ঘিরে। স্বপ্নের শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সেই লক্ষ্য পূরণে 'ক্লিন নভি মুম্বই, হেলথ নভি মুম্বই' এই স্লোগান নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। একসময় ভারতের পরিচ্ছন্ন এবং যাবতীয় নাগরিক সুবিধাসম্পন্ন এক নম্বর শহর হবে এটা।

এই শহরে বাংলাদেশ থেকে আগত একশো তরুণ অতিথিকে অভিনন্দন। সুযোগ পেলে এবার চেষ্টা করব বাংলাদেশ ঘুরে আসার। বাংলাদেশ দেখার ইচ্ছা আমার বহুদিনের।'

এ পর্ব শেষে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্কিমের যৌথ আয়োজনে 'কনভারশেসন উইথ ডাইভারসিটি' নামের ইন্টারএকটিভ সেশন ও কালচার একচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কড়া রোদের মধ্যেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব পোশাক ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাংলাদেশের একশো তরুণকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। হাতে লেখা কার্ড ও ফুল তৈরি করে উপহার দেয় তারা। পাশাপাশি অসাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। মারাঠী ভাষাভাষী হয়েও অসাধারণ বাংলা গান গেয়েছে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। সেই সঙ্গে একশো তরুণের পক্ষে বাংলাদেশেরও একটি দল গানে অংশগ্রহণ করে। নাচেও অংশগ্রহণ করে। দুই দেশের মেলবন্ধন তৈরি হয়। দুই দেশেরই জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়।

একইদিন রাতে যাওয়া হয় গেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়া। মুম্বইয়ের তাজমহল বলা হয় এ স্থাপনাকে। যেটি ১৯১১ সালে নির্মাণ শুরু হয়। শেষ হয় ১৯২৪ সালে। এই স্থাপত্যটি প্রথমে জেলে সম্প্রদায়ের স্থানীয় জেটি হিসেবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে এটিকে সংস্কার করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ও অন্যান্য প্রখ্যাত ব্যক্তিদের অবতরণস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হত। প্রথম দিকে, কেউ মুম্বই নৌকায় করে এলে এই স্থাপত্যটি প্রথমে দেখতে পেত। পর্যটকদের জন্য এটি অন্যতম একটি আকর্ষণ। নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেট দেখতে এই স্থাপত্যের মতই। একবিংশ শতকের শুরু থেকে এই স্থাপত্যে তিনটি সন্ত্রাসী হামলা হয়। ২০০৩ সালে দুইটি এবং ২০০৮ সালে চারজন বন্দুকধারী তাজমহল প্যালেস হোটেল আক্রমণ করে। এখন আর এ স্থাপনাটি আগের মত উন্মুক্ত নয়। জনসাধারণ ঠিকই এখানে ঘুরতে যান। পর্যটকরা এর সৌন্দর্য উপভোগ করেন। কিন্তু আরব সাগর দিয়ে গেট ওয়ে অফ ইন্ডিয়া হয়ে এখন আর কেউ শহরে ঢুকতে পারেন না। এ স্থাপত্যের পেছনেই তাজমহল হোটেল আছে। যেটি দেখতেও আকর্ষণীয়।

মুম্বইয়ে গিয়ে মেরিন ড্রাইভে একটু সময় না কাটালেই নয়। আরব সাগরের হিম বাতাসের ছোঁয়া মেলে। মুম্বই শহরের উঁচু দালান-কোঠার দেখা মেলে। মেরিন ড্রাইভ (বিচ) থেকে শহরের সৌন্দর্যে দুই চোখ জুড়িয়ে যায়। মেরিন ড্রাইভ দেখার পর শেষ হয় দিনটি।

সপ্তম দিন, ৩০ মার্চ যাওয়া হয় পুনেতে। সেখানে শুরুতেই মাহিন্দ্র কোম্পানী ঘুরে দেখা হয়। সেখানে গিয়ে জানান হয় বাংলাদেশের কৃষি, ব্যবসা এবং পরিবহন খাতে প্রচুর পরিমাণে মাহিন্দ্র কোম্পানীর গাড়ীর চাহিদা বেড়েই চলেছে। তা মেটাচ্ছে দেশের র‍্যাংগস গ্রুপ, কর্ণফুলী গ্রুপের মাধ্যমে। ২৫ বছর ধরে চলছে তা। প্রতি তিন মিনিটে একটি প্রাইভেটকার প্রস্তুত হয়। আর সাড়ে ছয় মিনিটে একটি ট্রাক তৈরি হয়। প্রতি ঘণ্টায় সবমিলিয়ে ২০টি গাড়ি তৈরি হয়। পুরো প্রক্রিয়া দেখার পর যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। মহারাষ্ট্রের পুনের চাকানে মাহিন্দ্র ভেহিকল ম্যানুফ্যাকচারারস লিমিটেড সাতশ একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে।

মাহিন্দ্র কোম্পানী ঘুরে দেখার পর যাওয়া হয় ইনফোসিস। ইনফোসিস লিমিটেড একটি গ্লোবাল কনসালটিং, তথ্যপ্রযুক্তি ও সফটওয়ার ডেভলপমেন্ট কোম্পানি। এটি ভারতের বৃহত্তম আইটি কোম্পানি, যাদের ৭০টি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, যারা ভারত তথা আধুনিক বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় কাজ করে যাচ্ছে। এটির হেড অফিস ব্যাঙ্গালোরে। এটি ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ২ লাখ কর্মী কাজ করে। বিশ্বের অন্যতম সফটওয়্যার কোম্পানি এটি। অসাধারণ ক্যাম্পাস। আছে সুবিশাল মাঠ। অডিটরিয়াম। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস নয় এটি। কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা দেয়ার জন্যই এমন ব্যবস্থা। আবাসন সহ সকল ব্যবস্থা এ ক্যাম্পাসে রয়েছে। ইনফোসিসের মতো কোম্পানিতে বাংলাদেশীদের কাজের সুযোগ রয়েছে। এরআগেও অনেকে সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে। ক্যাম্পাসের দেয়ালে দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি আছে। আছে ক্রিকেটারদের ব্যাটিং, বোলিং করার বিভিন্ন রূপের খোদাই করা রূপ। ইনফোসিস ঘুরা শেষে সপ্তম দিনের শেষ। আরেকটি দিনের অপেক্ষা। যেন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে সময়।

একশোজনের তরুণদল

সুমন সাহা

আমরা একশোজনের তরুণদল
বাংলাদেশে থেকে এসেছি
তোমাদের জানতে, আমাদের জানাতে
চোদ্দশো চব্বিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে
(আটশো পঁচাশি মাইল পাড়ি দিয়ে)
সৌহার্দ-সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে
আমরা তোমাদের কাছে এসেছি।
আমরা একশোজনের তরুণদল
বাংলাদেশে থেকে এসেছি
দুই দেশের মানুষ আমরা
সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকি
এসো বন্ধু হাতে হাত রাখি
বন্ধুর পথে এসো বন্ধু হাঁটি।

মুম্বাইয়ে এবং ভারত ভ্রমণের শেষদিনে, ৩১ মার্চ শুরুতেই জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী গিয়ে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখা হয়। এরপর ছত্রপতি শিবাজী জাদুঘর ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা হয়। দুই স্থানেই ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির পুরো রূপ যেন মিলে একাকার। এরপর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গিয়ে ক্রিকেট মাঠের সান্নিধ্য নেওয়া হয়। ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে জিতে ভারত। এ স্টেডিয়ামেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয়বারের মত চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। সেই ইতিহাস গড়া স্টেডিয়ামের গ্যালারীতে বসার সুযোগ করে দেওয়া হয় তরুণদের। এরপর দাদা সাহেব ফালকে চিত্রনগরী (ফিল্ম সিটি) ঘোরা হয়। খুব অল্প সময় ঘুরে দেখা হয়। এই অল্প সময়েই শুটিং স্পটগুলোতে কিভাবে ফিল্ম কিংবা নাটক তৈরি হয়, তা বোঝানো হয়। ভারতের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বিশ্বে ক্ষমতাধর ইন্ডাস্ট্রিও। মুম্বইয়ের এ ফিল্ম সিটি বিখ্যাত। ফিল্ম সিটি ঘুরে হোটেলে ফেরা হয়। সেই সঙ্গে শেষ হয় একশো তরুণের ভারত সফর। পুরো সফরটি আয়োজন করে ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক। সবসময় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনটি বাস সার্বক্ষণিক রাখা হয়। একশো প্রতিভাবান তরুণ দেশের প্রতিনিধি হয়ে ভারত সফরে যান। চোখের পলকে যেন আটটি দিন শেষ হয়ে যায়।

আটদিন দিল্লি, আগ্রা, পুনে ও মুম্বাই মিলে কাটানো হয়। একশো তরুণের সঙ্গে থেকে অনেক কিছু শেখা হয়েছে। জ্ঞান আহরণের সুযোগ মিলেছে। নিজেকে আগের চেয়েও স্বাবলম্বী মনে হচ্ছে। নতুন অনেক বন্ধু তৈরি হয়েছে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যত পথ চলার ক্ষেত্রে এ সফর সারাজীবনের পুঁজি হয়ে থাকছে। তবে তৃতীয় দিন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা মিলেছে। তাঁর প্রেরণাদায়ী বক্তব্য মিলেছে। চতুর্থদিন যে ভারত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে স্বাক্ষাৎ হয়, তাঁকে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়, তাঁর কথা শোনার সুযোগ হয়; তা যেন মনে গেঁথে আছে। তিনি যে বললেন, 'কেমন আছ, আমার সোনার বাংলা'। সেটিই যেন বারবার কানে বাজে। মোদি দর্শন এবং তার কণ্ঠে শোনা 'আমার সোনার বাংলা' যেন এ সফরের সবচেয়ে বড় পাওয়া হয়ে থাকল।

মিথুন আশরাফ সাংবাদিক ॥ সদস্য, ১০০ তরুণ প্রতিনিধিদল ২০১৮

সৌহার্দ // ২

বাংলাদেশ-ভারত অভিন্ন সংস্কৃতি

আরাফাত জোবায়ের

'বাংলাদেশে এখন উদীয়মান শিল্পী কে?', 'তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান কেমন?', 'ঢাকা শহরের যানজট আসলেই এত কেন?' বাংলাদেশ নিয়ে এ রকম অনেক প্রশ্ন ছিল মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের জানার অদম্য আগ্রহ। আমার ক্রীড়া সাংবাদিকতার পরিচয় পাওয়ার পর কয়েকজন সাকিব-তামিম-মোস্তাফিজের কথা জানতে চান। সাকিব ধারাবাহিকভাবে কীভাবে এত রান, উইকেট নেন। তামিমের আগ্রাসী ব্যাটিংয়েরও অসম্ভব ভক্ত তারা।

'কালচার ডাইভারসিটি: ইন্টারেকটিভ সেশন' শীর্ষক এক ট্যাগ লাইনে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারের একাংশে বাংলাদেশ থেকে আগত ১০০ তরুণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্মুক্ত আলোচনা হয়। সেই আলোচনায় দুই দেশের তরুণরা দুই দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়ন, জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা, বাংলাদেশের উঠতি গায়ক-গায়িকাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন হয়। বাংলাদেশের তরুণরা যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। বাংলাদেশের যুবপ্রতিনিধিরাও তাদের কাছ থেকে মুম্বইয়ের নায়ক-নায়িকাদের বেড়ে উঠা, মুম্বই সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নেবার চেষ্টা করেছে। দু'পক্ষের প্রশ্নোত্তরে দারুণ উপভোগ্য সময় কাটে। অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশ ছিল আরো প্রাণবন্ত।

ভারতের ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ভরতনাট্যম পরিবেশন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনেক বিভাগের পরীক্ষার সূচি। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের জন্য পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনেক সময় দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা কোরাসে গান পরিবেশন করেন। মারাঠী হয়েও বাংলার জনপ্রিয় গান 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে', 'কি করে তোকে বলব, তুই যে আমার' গায় সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশের তরুণরাও নিজেদের সংস্কৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করে। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী রণবীর সাহা নাচ পরিবেশন করেন। সন্ধি, সুজন, অনন্যা, রিয়াদ, পিংকি, সেমন্তী বাংলাদেশের জনপ্রিয় গানগুলো কোরাসে গান। সন্ধি, সুজন, রিয়াদ গিটারে ও রাতুল কাহনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটরিয়াম মাতিয়ে তোলেন। দু'দেশের জাতীয় সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্ক ও আন্তরিকতা বোঝাতে হলে সেমিনারে প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তের ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। পড়ন্ত বিকেল। সূর্য পশ্চিমকোণে হেলে পড়ছে। তাপমাত্রা ৩০-এর উপরে। এমন গরমেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ৪০-৫০জন শিক্ষার্থী। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ রাজ্যের নিজস্ব ঐতিহ্যপূর্ণ পোশাক ও প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে। কয়েক গজের মধ্যে পুরো ভারতের খণ্ডচিত্র। মূল ভবনে প্রবেশ করতেই হাতে তৈরি কাগজের ফুল ও হাতে লেখা কার্ড দিয়ে শুভেচ্ছাপত্র– আন্তরিকতা ও ভালবাসার অসাধারণ নিদর্শন। ছুটির দিনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের জন্য সকাল থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। পুরো আয়োজনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল মুগ্ধ। সফরসঙ্গী ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারের নৃত্যশিল্পী সিনথিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল, 'অসাধারণ মুহূর্ত। অভ্যর্থনা, পারস্পরিক আলোচনা, সাংস্কৃতিক পর্ব– সব মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী তাহারাতের এটা ছিল প্রথম বিদেশ সফর। প্রথম সফরেই এমন সম্মান পেয়ে যারপরনাই অভিভূত তাহারাত, 'পার্শ্ববর্তী ভারতের শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশকে এরকম সম্মান করে ও ভালবাসে, এ সফরে না এলে বুঝতেই পারতাম না।'

মুম্বইয়ের মত দিল্লিতেও বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতি ভারতীয়দের আন্তরিকা ও ভালবাসার ছোঁয়া পেয়েছি। দিল্লি পার্ক হোটেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস একসঙ্গে উদ্‌যাপন করেছি। ঐ দিনই সন্ধ্যায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের নৈশভোজে দারুণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। গানের সাথে নাচের এত দারুণ মিশ্রণে সবাই মুগ্ধ হয়ে একের পর এক নাচের অনুরোধ করছিলেন। পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের পাশাপাশি দু'দেশের তরুণরাও একসঙ্গে নেচে-গেয়ে অনুষ্ঠান মাতিয়েছিল। যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. এ কে দুবে বিষয়টি দারুণ উপভোগ করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারত– দুই দেশের সংস্কৃতি, রুচিতে অনেক মিল রয়েছে। দুই দেশের তরুণদের মেধাও প্রায় কাছাকাছি। এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের তরুণরা আরো কাছাকাছি আসতে পারবে।' দিল্লির বিখ্যাত মহিলা কলেজ লেডি শ্রীরাম কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না থাকলেও দুই দেশের সংস্কৃতি নিয়ে একাডেমিক আলোচনা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ নীতাকুমার। তিনি দুই দেশের সংস্কৃতি নিয়ে দারুণ কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। লেডি শ্রীরাম কলেজের শিক্ষার্থীরাও বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা বিষয়ে জানতে চান। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলও দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজের কৃতিত্ব, শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা তথ্য জেনে নেয়।

আরাফাত জোবায়ের সাংবাদিক ॥ সদস্য, ১০০ তরুণ প্রতিনিধিদল ২০১৮

সৌহার্দ // ৩

আমার দেখা ভারত

জানা-অজানা গল্পকথা

তানিয়া এ্যানি

মূল ফটক পেরিয়ে দ্বিতীয় দরজায় যাওয়ার ঠিক আগের মধ্যভাগে দাঁড়িয়ে চোখের পলক একবিন্দু দু'বিন্দু এদিক ওদিক সরলেই পুরো তাজমহলের অবয়ব বদলে যেতে থাকে। কখনো ছোট থেকে বড় হচ্ছে কখনো বড় থেকে ছোট। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য অবলোকন করছে সবাই! সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকে কাঠের বেঞ্চিতে বসলেই পেছনে তাজমহলের নয়নাভিরাম উপস্থিতি। এগুতে হবে বাঁ-দিক ধরে। এগিয়ে গিয়ে একটা নির্ধারিত জায়গায় চোখে কালো চশমা জড়িয়ে দাঁড়ানো আপনার পাশের জনের চোখের দিকে তাকিয়েই হতবাক সবাই! চোখের আয়নায় হাজির আস্ত তাজমহল! আর সবাই হুমড়ি খেয়ে ব্যস্ত ছবি তোলায়!

এমন সব অবাক করে দেওয়া না দেখা বিষয় হাতে ধরে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন ট্যুরিস্ট পুলিশ ইন্সপেক্টর সুশান্ত কাউর। কেবল না দেখা বিষয়ই নয় আমাদের জানিয়েছেন অনেক না জানা ইতিহাসও।

তাজমহলের ঠিক মূল ভূখণ্ডের মাঝেই রয়েছে সম্রাট শাহজাহানের পত্নী মমতাজের সমাধি। বেগম মূলত মমতাজ মহল নামে পরিচিত আরজুমান্দ বানু, যাঁর প্রতি ভালবাসায় তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজাহানের এই অমর নির্মাণ, তা আসলে কতখানি ভালবাসার টানে আর কতখানি নিজের ক্ষমতা আভিজাত্য প্রকাশে, সে-প্রশ্ন আজো বাতাসে ভাসে।

জানিয়েছেন ১৬৩২ সালে শুরু হওয়া এই স্থাপনাটির নির্মাণ কাজ ২০ হাজার শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ হয় ১৬৫৩ সালে। ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে খ্যাত এই স্থাপনাটি মুঘল স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিশ্বখ্যাত হলেও এর নির্মাণশৈলীতে পারস্য-তুরস্ক-ভারতীয় এবং ইসলামী স্থাপত্য-শিল্পের সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। এর নির্মাণ কাজে ১০০০ হাতিও ব্যবহৃত হয়েছে। ভারি ভারি পাথর বহনে এদের ব্যবহার করা হত। তাজমহলের ঠিক মূল ভূখণ্ডের মাঝেই রয়েছে সম্রাট শাহজাহানের পত্নী মমতাজের সমাধি। বেগম মূলত মমতাজ মহল নামে পরিচিত আরজুমান্দ বানু, যাঁর প্রতি ভালবাসায় তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজাহানের এই অমর নির্মাণ, তা আসলে কতখানি ভালবাসার টানে আর কতখানি নিজের ক্ষমতা আভিজাত্য প্রকাশে, সে-প্রশ্ন আজো বাতাসে ভাসে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫৬১ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত মার্বেল পাথরে নির্মিত এই স্থাপনার চারপাশের চারটি পিলার খুব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চারদিকে হেলে আছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয় এই স্থাপনাটি এমনভাবে নির্মিত যে বড় ধরনের কোন দুর্যোগ যেমন ভূমিকম্প আঘাত হানলেও এই স্থাপনাটি ভেঙে ছিটকে পড়ার কোন আশঙ্কা নেই– মাটির দিকে সোজা বসে পড়বে পুরো তাজমহলটি। সেইজন্যেই চারপাশের মূল পিলারগুলো এমন হেলানো!

এমন চমকপ্রদ সব তথ্য দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করছিলেন ইন্সপেক্টর সুশান্ত। একজন ট্যুরিস্ট ইন্সপেক্টর এত তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারেন, এটা নিঃসন্দেহে অবাক করার বিষয়। রাষ্ট্রীয় সফরের অংশ হওয়ার কারণে আমরা পেয়েছিলাম ইন্সপেক্টর সুশান্তকে। কিন্তু যে-কেউ ঘুরতে গেলেও তাজমহলের গেটেই পেয়ে যাবেন অসংখ্য ট্যুরিস্ট গাইড যারা আপনাকে পুরো তাজমহল ঘুরিয়ে দেখাবে ইতিহাস শুনিয়ে শুনিয়ে, শুধু তাই নয় কোন্ পাশ থেকে কোন্ বেলায় তাজমহল ঠিক কেমন দেখায় এমনটাও জানিয়ে দেবে তারা। কেবল হিন্দিভাষী নয়, আপনি চাইলে পেয়ে যাবেন ইংরেজিভাষী ট্যুরিস্ট গাইডও।

বিস্তর এলাকায় ভবঘুরের মত ঘুরতে গিয়ে আসল সৌন্দর্যটাই আসলে অদেখা থেকে যায় সঠিক নির্দশনার অভাবে। সেই আফসোস তৈরির সুযোগ নেই এখানে। কেবল তাজমহল নয়, আগ্রা ফোর্ট, কুতুব মিনার, হুমায়ুনের সমাধি– প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক স্থাপনায় আপনার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে ইতিহাস জানা ট্যুরিস্ট গাইডরা। স্বল্প সময়ে পুরো স্থাপনার সৌন্দর্য-ইতিহাস আপনার চোখের সামনে তুলে ধরতে পুরোদস্তুর প্রস্তুত তারা। এমনকি মুম্বই ফিল্ম সিটিটাও তৈরি হয়ে আছে অন্যতম পর্যটক আকর্ষক জায়গা হিসেবে। সেখানে কেবল টুরিস্ট গাইডই নয়, ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য আছে ট্যুরিস্ট বাসও।

যেতে যেতে পথে...

দিল্লি থেকে আগ্রা চারঘণ্টার পথ। ভোরে যাত্রা শুরু করা, তারপর তপ্ত রোদ পথ জুড়ে। অথচ ক্লান্ত শ্রান্ত হওয়ার সুযোগ নেই। পথের সৌন্দর্য ঘুমকাতর চোখকেও টেনে ধরে রাখে পথের পানে। পথের দু'ধারে নানা নান্দনিক স্থাপনা তো আছেই, তারচেয়েও বেশি দৃষ্টি কাড়ে পরিচ্ছন্নতা। ১৯৭ কিমি হাইওয়ে। পথের মাঝের ডিভাইডার জুড়ে ফুটে আছে রঙ বেরঙের ফুল, আছে পাতাবাহার, নিয়মিত পরিচর্যায় থাকেও, সেটাও স্পষ্ট। এতটা পথ এতটা পরিচ্ছন্ন রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। তবুও আছে আর পথ জুড়ে ছুটছে পর্যটকবাহী বাস। পর্যটকদের জন্য রয়েছে আলাদা বাসের ব্যবস্থা। লম্বা সময়ের বাস জার্নির বিরক্তিতে আগ্রা যাওয়া কিংবা তাজমহল দেখতে না যাওয়ার ভাবনা কখনো মাথায় আসবেই না পথের মুগ্ধতায়। তাজমহল দেখেন আর না দেখেন দিল্লি থেকে আগ্রার হাইওয়েই আপনাকে টানবে বারংবার। একই জিনিস লক্ষণীয় মুম্বই থেকে পুনের হাইওয়েতেও। একপাশে পাহাড় অন্যপাশে নাগরিক জীবন– অসাধারণ মুগ্ধতা সৃষ্টি করে। আর পথে পথে পাহাড়ের ভাজে টানেল। আধো আলো আধো ছায়ার মোহ। লম্বা যাত্রাপথে ছুটে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যা দেখতে যাচ্ছেন তার প্রতিই মনোযোগ নষ্ট হবে সে সুযোগ কই বরং আগ্রহ বেড়ে যাবে কয়েকগুন। ঠিক এভাবেই পরিকল্পনামাফিক সাজানো হয়েছে সকল ঐতিহাসিক এবং পর্যটন এলাকাগুলোকে। শুরু থেকে শেষ অব্দি পুরোটা পথের ভ্রমণ-দর্শন লেপ্টে থাকবে আপনার চোখে।

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী...

লেডি শ্রীরাম কলেজ ফর উইমেন এমন এক ক্যাম্পাস যেখানে পা রাখলে আপনার মনে হবে ইশ্-শ্ এখানে যদি থেকে যেতে

দিল্লি কিংবা মুম্বইয়ের রাজপথে মেয়েদের সরব উপস্থিতি। দিনের শেষভাগে কাজ শেষ ফিরছে নিজের মত করে। আত্মবিশ্বাসের জায়গাটাই হয়তো তাদের এগিয়ে দিয়েছে কয়েকশো মাইল। এদের দেখলে মনে হয়, বিদ্রোহী কবি যথার্থই বলেছেন, "বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি/ চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী/ অর্ধেক তার নর।"

পারতাম। দৃষ্টিনন্দন গোছালো পরিপাটি এবং সর্বোপরি পরিচ্ছন্ন। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নিয়ে কথা বলব। শিক্ষার মান, কাজের ক্ষেত্র, সবদিক থেকে এগিয়ে এই ক্যাম্পাস। একটা পুরো ক্যাম্পাস মেয়েদের ক্যাম্পাস। অনুষ্ঠান আয়োজন থেকে শুরু করে ফটোগ্রাফিটাও করছে মেয়েরাই। একেকজনের চোখের ঝিলিক জানান দেয় ব্যক্তি-নিজেকে নিয়ে কি পরিমাণ আত্মবিশ্বাস কাজ করে তাদের নিজেদের। কলেজের শিক্ষক হিসেবে আছেন অধিকাংশই নারী। লেকচারভেদে কলেজে নিয়ে আসা হয় স্ব স্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ গেস্ট টিচারও। জানা যায় এই ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের চাকরি মিলে যায় ছাত্রাবস্থাতেই।

একই চিত্র লক্ষণীয় প্রধানমন্ত্রী কুশল কেন্দ্র এবং বিদ্যালংকার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, মুম্বই ইউনিভার্সিটিতেও। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উপস্থিতি সেখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ছেলেদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ শিখছে মেয়েরাও। কোন অংশে পিছিয়ে নেই তারা। পথে নেমে যাচ্ছে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতেও। দিল্লি কিংবা মুম্বইয়ের রাজপথে মেয়েদের সরব উপস্থিতি। দিনের শেষভাগে কাজ শেষে ফিরছে নিজের মত করে। আত্মবিশ্বাসের জায়গাটাই হয়তো তাদের এগিয়ে দিয়েছে কয়েকশো মাইল। এদের দেখলে মনে হয়, বিদ্রোহী কবি যথার্থই বলেছেন, "বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি/ চির কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী/ অর্ধেক তার নর।"

পথের ধারে হাট বাজারে...

দিল্লি হাট। একই ছাদের নিচে স্থানীয় এবং দেশীয় ঐতিহ্য বহনকারী নানা জিনিসপত্র– শাড়ি, জামা, বিছানার চাদর, শো পিস, মেয়েদের গয়না, গৃহসজ্জার নানা সামগ্রী, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, স্যুভেনির– সবই পেয়ে যাবেন। সময়ও বাঁচল, সাথে সাধ-সামর্থ্যের ভেতরে ইচ্ছেমত কিনে নেওয়া গেল। কেবল কেনাকাটার জন্যই নয়, ঘুরে দেখার মতও একটা জায়গা দিল্লি হাট। ভারতের চিরায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিকতার চমৎকার সমন্বয় দিল্লি হাট। যে-কোন পর্যটন এলাকায় নানা দর্শনীয় স্থানের পাশাপাশি পর্যটকদের আকর্ষণ থাকে স্থানীয় শিল্প ঐতিহ্য হস্তশিল্পের প্রতিও। সেইদিকটিকে মাথায় রেখেই দিল্লি হাট একের ভেতর দশের সমন্বয়।

ভোজনে পেট পূজনে...

ফরাসি শব্দ Flamboyante মানে অতিরিক্ত রঞ্জিত। মুম্বইয়ের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অবস্থিত ফ্ল্যাম্বয়েন্ট রেস্টুরেন্টের বর্তমান অবস্থানের ঠিক মাঝখানে ছিল একটা মস্ত গুলমোহর বা কৃষ্ণচূড়া গাছ। কৃষ্ণচূড়া ফুল যে অতিরিক্ত রঞ্জিত, সে তো বলাই বাহুল্য। রেস্টুরেন্টের নির্মাণকাজ শুরুর আগেই প্রাকৃতিক কারণে গাছটি মারা পড়লে মালিক নিজ রেস্টুরেন্টের নাম রাখলেন ফ্ল্যাম্বয়েন্ট, অতিরিক্ত রঞ্জিত। কেবল দর্শনীয় হিসেবেই নয়, খাবারের মান এবং খাবারের সমাহারের দিক দিয়েও অতুলনীয় ফ্ল্যাম্বয়েন্ট। টানা জার্নি, টাইট শিডিউল আর হাঁসফাঁস গরমে ফ্ল্যাম্বয়েন্টের খাবার এবং পরিবেশ আমাদের দারুণ স্বস্তি এনে দিয়েছিল। ঠাণ্ডা পানীয়র রসনা তৃপ্তি দিয়ে শুরু হয়ে বুফেতে একইসঙ্গে ত্রিশেরও অধিক খাবারের আয়োজন। ইন্ডিয়ান খাবারের সঙ্গে ছিল ইতালিয়ান খাবারও। আর সেই সঙ্গে মুম্বইয়ের বিখ্যাত পানিপুরি ফুচকা পাপড়ি চাট। পানিপুরি পাপড়ি চাটের সামনে আমাদের উপচেপড়া ছেলেমানুষি বেশ উপভোগ করছিলেন তারাও। নিয়মিত বুফে আয়োজন চলে এই রেস্তোরাঁয়। সরকারি বন্ধের দিন এবং বাচ্চাদের জন্য বুফের প্রাইস ভিন্ন ভিন্ন। বুফের দাম যতই বাড়ুক কমুক খাবারের সম্ভাব্য মান থাকবে একই এবং সমৃদ্ধ। প্লেইন রাইস থেকে বিরিয়ানি, আইসক্রিম থেকে পানিপুরি– সব থাকছে একই আয়োজনে।

২৪ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ। আমরা ১০০ জনের দল ঘুরে বেড়িয়েছি দিল্লি ও মুম্বই শহরের নানা প্রান্তে। অনন্য এই অভিজ্ঞতায় শিখেছি জেনেছি অনেক কিছু। আছে উন্নয়ন, আছে দারিদ্র্যও। তবুও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি, সেটি হচ্ছে পরিকল্পনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ। আমি ঠিক কোথায় ভাবব, কোথায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব এবং কোন্ খাতের উন্নয়নে সবচেয়ে লাভবান হতে পারব, এই ভাবনা, এই বোধটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১০০ তরুণের এই সফর শেষে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাদের ভাবনাকে নিশ্চয়ই প্রসারিত করবে। আমাদের কাজেই এগিয়ে যাবে দেশ, সমৃদ্ধ হবে দু'দেশের মৈত্রী। আমরা স্বপ্ন বুনি কাঁটাতারের জাল ডিঙিয়ে ভালবাসার।

তানিয়া এ্যানি
ফিচার রাইটার, দৈনিক পার্বত্য চট্টগ্রাম
সদস্য, ১০০ তরুণ প্রতিনিধি দল ২০১৮

সৌহার্দ // ৪

তারুণ্যের সেতুবন্ধন

জয়শ্রী ভাদুড়ী

সন্ধ্যা পেরিয়ে দিল্লির আকাশে আলো ছড়াতে শুরু করেছে আধখানা চাঁদ। সকালে একই পথে যাওয়ার সময় লালচে বাড়িটার ঝুল বারান্দায় আয়েশি ভঙ্গিতে বসে ছিল সাদা ধবধবে দুই জোড়া কবুতর। কিন্তু ফেরার সময় বাসের গ্লাসের ফাঁকে ইতিউতি করলেও খোঁজ পেলাম না তাদের। হয়তো ফিরে গেছে নীড়ে। সময়কে পিছনে ফেলে ছুটে চলেছি আমরা। গন্তব্য দিল্লির হোটেল পার্ক ইন।

পৌঁছতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা । বাংলাদেশী ইয়ুথ ডেলিগেশন টিমের শত যুবাকে বরণ করে নিল ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক। বাংলাদেশী তরুণদের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠলেন ভারতীয় তরুণরা। গোল টেবিলে নিজের দেশ সম্পর্কে জানাতে এবং প্রতিবেশী দেশকে আরো একটু জানতে চলছে কথোপকথন। এদিকে মঞ্চে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে বাংলাদেশী এবং ভারতীয় দু'দেশের তরুণদের অংশগ্রহণে চলছে গান, নাচ ও কবিতা আবৃত্তি।

কৈশোর থেকে তারুণ্যে ডালপালা ছড়ানো বটবৃক্ষের চারপাশে গড়ে উঠেছে মুক্তমঞ্চ। পুরনো বইয়ের ঝাঁঝালো গন্ধ থেকে মুখ তুলে দেখা যায় দিন শেষ, এখন প্রায় সন্ধ্যা। ঝাঁক বেঁধে ঢেউ খেলিয়ে পাখিরা উড়ে চলেছে ঝাঁকড়া আম গাছটার মগডালে। বাসের হুইসেলে সম্বিৎ ফিরলেও মন পড়ে রইল বাহারি মুখোশ আর রামলীলা নাট্যায়নে। তরুণমনে দাগ কেটে রইল লাল মাটির ঘর আর শিল্প-সাহিত্যের শেকড়ের টান।

এক পর্যায়ে সাউন্ড বক্সে বেজে ওঠে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের ফোক গান। গানের সঙ্গে পঞ্জাবিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মঞ্চে ওঠে একদল নৃত্য শিল্পী। জনপ্রিয় নাচ ভাংড়ার তালে মুহূর্তে জমে উঠল আসর। শিল্পীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেচে উঠল তরুণরা। আবার বাংলাদেশী তরুণ শেখ কান্তা রেজা যখন গেয়ে উঠলেন 'সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী', সমস্বরে দুই দেশের তরুণরা গলা মেলাল তার সঙ্গে। দুই দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা আর অজানা গল্প জানা এবং জানানোর সেতু বন্ধনে রূপান্তরিত হয়েছিল বাংলাদেশী শত-যুবার এই ভারত ভ্রমণ।

ভারতের বিদেশ এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের আয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী তরুণদের এই সফরের জন্য মনোনীত করেছিল ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন। শিক্ষক, গবেষক, লেখক, শিল্পী, উদ্যোক্তা, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যম কর্মীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশী ইয়ুথ ডেলিগেশন ২০১৮ টিম। এই নিয়ে ষষ্ঠবারের মত ভারত ভ্রমণের সুযোগ পেল বাংলাদেশী তরুণরা।

২৪ মার্চ ঘড়ির কাঁটা ১০টা ছুঁতেই হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে আকাশপানে ছুটে চলল বিমান। পাখির চোখে ঢাকা দেখার আগ্রহ নিয়ে অনেকেই ঝুঁকে পড়েছেন জানালার গ্লাসে। গন্তব্য ভারতের রাজধানী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। মেঘকে পাশ কাটিয়ে দুই ঘণ্টার একটু বেশি সময় পার হতেই বিমানবালার ঘোষণায় জানা গেল আর কিছুক্ষণ পরেই ভারতের মাটিতে নামব আমরা। বিমানবন্দরে অবতরণের পরে সকল আনুষ্ঠানিকতা সেরে বাইরে এসে দেখি তিনটি বাস দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্য। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে তিনটি গ্রুপে ভাগ হয়ে শুরু হয় আমাদের যাত্রা। অনেকেরই এটাই প্রথম ভারত সফর আবার অনেকে ভারতে এলেও দিল্লিতে হয়তো এবারই প্রথম। সবার চোখে-মুখে উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাস। দুপুরের খাওয়া সেরে গাড়ি ছুটে চলে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টসের দিকে। এই সংগ্রহশালায় শুধু ভারত নয়, আরো অসংখ্য দেশের ইতিহাসকে ধরে রাখা হয়েছে বইয়ের পাতায়, গবেষণায়, সিডি আর ডিভিডিতে। সংস্কৃতি সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি এই সংগ্রহশালাকে দিয়েছে অনন্য মাত্রা। এই সংগ্রহশালায় রয়েছে ১ লাখ ৬৫ হাজার বই, ২ লাখ ৩৫ হাজার ফিল্মস এবং ১ লাখ ৫০ হাজার ভিজুয়্যাল ডকুমেন্ট। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধর্মের বইয়ের বিরল সংগ্রহ রয়েছে এখানে। এ ছাড়া লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী উপস্থাপনাকে ভিজুয়্যালি সংগ্রহ করা হয় এখানে। এই সংগ্রহশালা ঘুরে তরুণরা ভারত এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। সংগ্রহশালার পরিচালক অনুরাগ ত্রিবেদীর সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে এই সংগ্রহশালার জন্মলগ্নের গল্প। কৈশোর থেকে তারুণ্যে ডালপালা ছড়ানো বটবৃক্ষের চারপাশে গড়ে উঠেছে মুক্তমঞ্চ। পুরনো বইয়ের ঝাঁঝালো গন্ধ থেকে মুখ তুলে দেখা যায় দিন শেষ, এখন প্রায় সন্ধ্যা। ঝাঁক বেঁধে ঢেউ খেলিয়ে পাখিরা উড়ে চলেছে ঝাঁকড়া আম গাছটার মগডালে। বাসের হুইসেলে সম্বিৎ ফিরলেও মন পড়ে রইল বাহারি মুখোশ আর রামলীলা নাট্যায়নে। তরুণমনে দাগ কেটে রইল লাল মাটির ঘর আর শিল্প-সাহিত্যের শেকড়ের টান।

বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরলেও তরুণদের বিশেষ আকর্ষণের জায়গা ভারতের তরুণদের সঙ্গে কথোপকথন। কাছাকাছি বয়সের মানুষের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন মিল থাকে তেমন সমস্যা-সম্ভবনাও একই রকম হয়। তাই দিল্লির প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্রে যাওয়ার কথা শুনে আগ্রহী হয়ে ওঠে তরুণরা। প্রতিষ্ঠানটিতে পৌঁছতেই তাদের কার্যক্রম এবং পদ্ধতি সম্পর্কে শুরুতে একটা বিফ্রিং দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত ভারতের তরুণদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে-কলমে দক্ষ করে তুলছে। এখানে নারীদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলক বেশি দেখা যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক শেখানো হচ্ছিল শিক্ষার্থীদের। চোখের সমস্যায় যে টেস্টগুলো করা হয় তার যাবতীয় মেশিন এখানে আছে। কিভাবে সেগুলো পরিচালনা করতে হয় তা শেখানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। গর্ভবতী মায়ের সেবা দিতে করণীয় বিষয় জানানো হচ্ছে, হাত ভেঙে গেলে প্লাস্টার করা বা কেটে গেলে কিভাবে সেলাই করে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয় সেটাও এখানেই শিখছেন শিক্ষার্থীরা। শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞান নয়, কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর এই প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষ জনবলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে এই প্রতিষ্ঠানই। এই প্রশিক্ষণে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় খুব সহজভাবে শেখানোয় খুব সহজেই শিখতে পারে শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশী তরুণরা গুরুত্বসহকারে দেখার চেষ্টা করছিলেন বিষয়টিকে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী দেখা যায় অমিয় প্রাপণ চক্রবর্তীকে। তার আগ্রহের কারণ জানতে চাইলে বলেন, তরুণদের কিভাবে প্রশিক্ষিত করা যায় সেটা নিয়ে আমি কাজ করি। খুব সম্প্রতি এ ধরনের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি। এদের শেখানোর পদ্ধতি এবং চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা থেকে আমরা শিখতে পারি। এ ছাড়া এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি আমাদের দেশের কোন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় করা যায় সেটাও ভাল ফল বয়ে আনবে। তরুণদের নিয়ে শুধু তরুণরা নয়, সরকারও চিন্তা করছে।

হোটেল পার্ক ইনে অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে কথা হয় ভারতের ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স বিভাগের সচিব ড. এ কে দুবের সঙ্গে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের তরুণদের পড়াশোনা বাদ দিয়ে পরিবর্তন আনার চিন্তা করা যাবে না। তবে শুধু ফলাফল নয়, দক্ষতা অর্জনের দিকে নজর দিতে হবে। কারণ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা তরুণদের পৌঁছে দেবে সাফল্যের শিখরে। দুই দেশের তরুণদেরই খুব দ্রুত হতাশ হবার একটা প্রবণতা আছে বলে আমার মনে হয়। হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞানের আলোকে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তরুণদের বিষয়ে ভারতের পরিকল্পনা কী জানতে চাইলে তিনি বলেন, তরুণদের জন্য আমরা বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। গ্রাম, উপজেলা, জেলা থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যায়ে আমরা কর্মসূচি চালু করেছি। এর মধ্য দিয়ে তরুণরা সচেতনতামূলক কাজ করছে, দক্ষতা অর্জন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। তারা সামাজিক সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছতা, বয়স্ক মানুষের পরিচর্যা, মাদক প্রতিরোধ এরকম বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করছে। আমরা মনে করছি তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। ইনস্টিটিউটের আওতায় তারা প্রশিক্ষিত হচ্ছে, পরবর্তীকালে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে প্রয়োজন অনুযায়ী। এজন্য রুটিনমাফিক পড়াশোনার বাইরে তরুণদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে আগ্রহ বাড়াতে হবে। রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইয়ুথ ডেভেলপ্‌মেন্ট ভারতীয় তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মূল কেন্দ্র। এখানে বেশ কয়েকটি বিষয়ে কোর্স চালু করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে

কর্মকর্তাদেরকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই তরুণদের প্রশিক্ষিত করার কার্যক্রম চলছে।

কতজন তরুণ এ প্রশিক্ষণের আওতায় আসবে জানতে চাইলে সচিব ড. এ কে দুবে বলেন, এই কর্মসূচির আওতায় ৪শো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থী পাঁচ বছরের মধ্যে এসব প্রশিক্ষণের আওতায় আসবে। আমরা পর্যায়ক্রমে এর আওতা বাড়াব। ফলে প্রায় ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের আওতায় আসবে। আমরা তাদের জন্য দুটি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছি। ইলেকট্রনিক বিষয় এবং তথ্য সংরক্ষণ বিষয়ে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। আর আরেকটি বিষয়, গ্রামের বা প্রত্যন্ত এলাকার অনেক শিক্ষার্থীর ইংরেজি বলা এবং বোঝার দক্ষতা কম থাকে। তাই তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমরা কোর্স পরিকল্পনা করছি। আমরা গবেষণা করে দেখেছি এ বিষয় দুটি তরুণদের দক্ষতার পরিধি বাড়াবে। তরুণদের ইতিবাচক বিষয়ে চিন্তা করতে শেখাতে হবে, সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তুলতে হবে। কথায় কথায় সময় পেরিয়ে যায়, বিদায় বেলা উপস্থিত। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই তার কাছ থেকে। তবে সে সময়কে মনে করিয়ে দেয় মোবাইল ক্যামেরায় ধারণ করে রাখা ছবিখানা।

তরুণদের সঙ্গে মতবিনিময়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম হয়ে উঠেছিল দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজ ফর উইমেন। দু'দেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে উপস্থাপনা এবং মতবিনিময়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল অডিটোরিয়াম। সবুজ গাছের আঁচড় আর গাঁদাফুলের পাপড়িতে সাজানো অডিটোরিয়ামের মাঝে রঙগুলিতে ফুটে উঠেছিল ঐতিহ্যের ছোঁয়া। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে আসে দু'দেশ সম্পর্কে জানা-অজানা অসংখ্য তথ্য। দিল্লির পাট চুকিয়ে এবার উড়ান ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বইতে। ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেই চোখের সামনে ঢেউ খেলে যায় মুম্বই নিয়ে গোলপাকানো অসংখ্য জল্পনা-কল্পনা। মুম্বইয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থাপনা ঘুরে দেখার সঙ্গে দু'চোখ ভরে দেখে নিই নতুন করে গড়ে তোলা নভি মুম্বই শহরকে। শহরের রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার সবকিছুতেই রয়েছে একটা পরিকল্পনার ছোঁয়া। নভি মুম্বই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন মেয়র জয়ন্ত দত্তাত্রে সুতারের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা যায় সেই রহস্যের কথা। সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং সার্বিক পরিকল্পনায় পাল্টে গেছে এ শহর। শহরের গল্প তো জানা হল, কিন্তু মানুষের গল্প সমবয়সী তরুণদের গল্প তো অজানা থেকে গেল। ঘোরাঘুরি হলেও খটকা কাজ করছিল মনে। অবশেষে মুম্বইয়ের বিদ্যালঙ্কার স্কুল অফ ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি লাগছিল মনে। যাওয়ার পরে আমরা তো অভিভূত। কলেজের প্রধান ফটক পেরোতেই দেখি দু'পাশে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কেউ পঞ্জাবিদের মত পোশাক পরেছে, কেউ মারাঠি ভঙ্গিতে শাড়ি পরেছে, কেউ আবার চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়িতে বাঙালি সাজে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আমাদের। কলেজ অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করতেই আমাদের একটি করে ফুল আর সুনিপুণভাবে হাতে বানানো কার্ড দিয়ে অভ্যর্থনা জানায় শিক্ষার্থীরা। কার্ডটা খুলে ভেতরের লেখা পড়তে খুশিতে ভরে ওঠে মনটা। এখনো অনেকেই আছে যারা কারো জন্যে এত কষ্ট করে মেধা খাটিয়ে নতুন কিছু তৈরি করে। কার্ডটি সঙ্গে করে বাংলাদেশে নিয়ে আসব এই চিন্তায় আলতো করে ব্যাগে ভরে মনোযোগ দেই অনুষ্ঠানে। পরিচয় পর্ব শেষে শুরু হয় দুই দেশের শিক্ষার্থীদের মতবিনিময়। বিদ্যালঙ্কার স্কুল অফ ইনফরমেশন টেকনোলজির শিক্ষার্থীরা কী জানতে চায় তা আগেই লিখে জমা দিয়েছে শিক্ষকদের হাতে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে উঠে আসে অসংখ্য প্রশ্ন। উত্তর দিয়ে ভারতের বিভিন্ন বিষয় জানতে চায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা। আলোচনা পর্ব শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে শুরু হয় দুই দেশের পরিবেশনা। তারুণ্যের কোন গণ্ডি নেই, শেখার জানার শেষ নেই এই মেলবন্ধনে শেষ হয় অনুষ্ঠান। একটা সময় শেষ হয়ে আসে সফর, কিন্তু মনে থেকে যায় রেশ। ভারতের তরুণরাও বাংলাদেশকে আরো ভালভাবে জানতে-বুঝতে এদেশে আশার আগ্রহ ব্যক্ত করে। তাদেরকে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ হয় বাংলাদেশী শত তরুণের অবিস্মরণীয় এই ভারত সফর।

জয়শ্রী ভাদুড়ী
সদস্য, ১০০ তরুণ প্রতিনিধি দল ২০১৮

ভ্রমণ

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরতম গ্রাম

আসিফ আজিজ

তোড়জোড় চলছিল দার্জিলিং যাওয়ার। সঙ্গী পরিবারের সদস্য ও দুই সহকর্মী। প্রতিটি ট্যুরের মত কোথায় থাকব, কোথায় কোথায় ঘুরব এসবের রোডম্যাপ এঁকে নেওয়ার কাজ চলছিল। ইন্টারনেটে বিভিন্ন তথ্য ঘাঁটতে ঘাঁটতে খুঁজে পাওয়া গেল অনিন্দ্যসুন্দর এক জায়গা। নাম রিশপ। অনেক জায়গায় লেখা, এটাই পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরতম গ্রাম। শহরের কর্মময় যান্ত্রিক জীবন আর গ্লানি থেকে ক'দিনের জন্য মুক্ত থাকতেই ভ্রমণ পরিকল্পনা। তাই সুন্দরতম গ্রামে নিরিবিলি কাটানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলাম না কেউই। পরিকল্পনা বদলে প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠল রিশপ। পরে দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক।

দেশের বাইরে যাওয়ার ভিসা, ইমিগ্রেশনের ঝামেলা-ঝক্কি। তাতে আবার আটজনের গ্রুপ। পাহাড়ে গাড়ির আসন সংখ্যা চিন্তা করেই সংখ্যা এটা। ভিসার মারপ্যাঁচে তাই ভ্রমণ গড়ায় এপ্রিলে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভাল ছিল। মানে দিনে ১৫ থেকে ২২ ডিগ্রি তাপমাত্রা ঘোরার জন্য উপযুক্ত।

দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের ফুলবাড়ি ইমিগ্রেশন থেকে খুব কাছে শিলিগুড়ি। তবে বাংলাদেশে ইমিগ্রেশন সারতে বেশ সময় লাগে। আর ইমিগ্রেশন থেকে ওপারে ভারতীয় ইমিগ্রেশন পর্যন্ত যেতে পাড়ি দিতে হয় প্রায় কিলোমিটারখানেক পথ। এপথে আবার কোন বাহন নেই। শিলিগুড়ি বর্ডার থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার। কিন্তু এ পথটুকু লাগেজ নিয়ে পাড়ি দিতে বেশ কষ্ট। একটি ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কথা বলা ছিল আগেই। তাই ওপারে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাংলা জানা নেপালি চালক রাজু। স্মার্ট চালক। গা-গতরেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট।

এজেন্সির মালিক বললেন, আপনারা বাংলাদেশের মানুষ। আমাদের আপন। তাই রাজুকে কদিনের জন্য আপনাদের সঙ্গে দিলাম। যদি কোন সমস্যা হয় সেই সামলাতে পারবে। ঢাকা থেকে সারারাত জার্নি করে শিলিগুড়ি পৌঁছাতে হয়ে গেল দুপুর। মধ্যাহ্নভোজ সেরে রওয়ানা দিলাম প্রায় তিন ঘণ্টার পথ লাভার উদ্দেশে। পথে কিছু পাকা আম, কলা কেনা হল। শহুরে কোলাহল ছেড়ে একটু বাদেই শুরু হল চোখ জুড়ানো। সমতলের চা-বাগান সবুজ হতে শুরু করেছে তখন। একটু পরেই উপরে উঠতে শুরু করল রাজুর গাড়ি। সঙ্গে গান 'খিচ মেরা ফটো...'। পাহাড়ের কোন কোন বাঁক মানে পুরো ইউটার্ন। আর এসব পথে গাড়ি চালাতে ঝিম ধরলেই সমস্যা। পড়তে হবে কয়েক হাজার ফুট নিচে। তাই গানে সতেজ থাকার চেষ্টা সব সময় রাজুর। টাইগার বা সেবক ব্রিজের পর থেকেই পাহাড়গুলো আরও উঁচু হওয়া শুরু করল। পাথুরে শুকনো তিস্তা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কিছু করার ছিল না আমাদের। ব্রিজটি দার্জিলিংকে যুক্ত করেছে জলপাইগুড়ির সঙ্গে।

উত্তর-পূর্ব দিকে গরুবাথান হয়েই পৌঁছাতে হবে লাভা। গরুবাথান সংরক্ষিত বন। বড় বড় শাল-সেগুনের দেখা মিলল বনে। ভেতর দিয়ে মসৃণ রাস্তা চলে গেছে টানেলের মত। বনে চরা গরুর দেখা মিলল ক্ষণে ক্ষণে। গলায় আবার ঘণ্টি বাঁধা। গরুবাথান! অনেকটা জুড়ে আবার সেনাবাহিনির দখলে। মাঝে-মধ্যে রয়েছে সমতলের সবুজ চা বাগান।

শিলিগুড়ি থেকে লাভার দূরত্ব ১শো কিলোমিটারের বেশি। আর গরুবাথান ৬০ কিলোমিটার। এ পর্যন্ত উচ্চতা দেড় থেকে ২ হাজার ফুট। অন্তত আমাদের অল্টিমিটার অ্যাপস তাই বলছিল। অনেকটা পথ চলে গরুবাথানের শেষপ্রান্তে গিয়ে থামল রাজুর গাড়ি। জায়গাটি সমতল। সোজা রাস্তাটি চলে গেছে ডুয়ার্সের দিকে।

এখানকার পাহাড়ি পাথুরে ঝিরিটি সত্যি মুগ্ধ করার মত। পাহাড় থেকে নেমে এসেছে স্বচ্ছ পানি। হাত-মুখ পা ভিজিয়ে, ইচ্ছেমত ছবি তুলে বসলাম এক লেপচা নারীর চা দোকানে। স্থানীয়দের কাছে জানা গেল এখানে নেমে ছবি তোলাও খুব নিরাপদ নয়। কারণ হঠাৎ পাহাড়ি ঢল এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। এর জন্য যে বর্ষার সিজন লাগে সেটা নয়। সুতরাং সাবধান। অবশ্য দলের সবচেয়ে ছোট সদস্য সামি কিংবা সুমেহেরার কোন বিষয়ে কোন ক্লান্তি, কষ্ট ছিল না। দিব্যি উপভোগ করছিল তারা।

ছবি আর সেলফিতে শামীম ভাইয়ের এগিয়ে থাকার শুরু এখানেই। হিন্দি তারা ঠিকমত বলতে কিংবা বুঝতে পারে না। তবে নেপালি চালক রাজু চালিয়ে নিল সে যাত্রা। প্রথম পেটে পড়ল বিখ্যাত দার্জিলিং টি। নির্ঘুম রাত ও টানা ভ্রমণের ক্লান্তি যেন অনেকটা উবে গেল দূর পাহাড়ের হাতছানি, স্বচ্ছ পানি আর গা-সওয়া ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়।

পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে তবেই যেতে হবে লাভা। রাজুর হিসেব অনুযায়ী সাত পাহাড় পার হতে হবে। পাহাড়ের প্রতিটি বাঁকই ভয়ংকর। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল কোন চালক হর্ন বাজান না। কোথাও 'শূন্য', কোথাও 'ইউ', আবার কোথাও ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মত করে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলতে লাগল আমাদের পথ।

মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে উচ্চতা পরখ করতে করতে একসময় উঠে গেলাম প্রায় ৭ হাজার ফুটের কাছাকাছি। নিচের পাহাড়ের গায়ে প্রদীপের মত ঝুলতে থাকা বাড়িগুলো তখন দূর আকাশের তারার মত মিট মিট জ্বলছে। পাহাড়ে সন্ধ্যা নামলে ঠাণ্ডাও বাড়তে থাকে। আমাদের গাড়ির গ্লাসও বন্ধ হল ক্রমে। একটু এগিয়ে উঁচু পাহাড়ে দেখা মিলল আরেক তারার রাজ্য। রাজু বলল ওটাই লাভা শহর।

এটি মূলত লেপচা ও ভুটিয়া অধ্যুষিত এলাকা। কিছু হোটেল আছে বাঙালি। শহরটি উঠে গেছে খাড়া নিচু থেকে উঁচুতে। লাভা মনেস্ট্রিকে যদি নিচ ধরা হয় তাহলে জাদুঘরটি উঁচুতে। যাহোক পাহাড়ের গায়ে ক্লাসিক নামে একটি হোটেলে হল আমাদের আবাস।

পানির সংকট এখানে প্রকট। পানি আসে নিওরা ভ্যালি থেকে। এর জন্য খরচও করতে হয় বেশ। এটা টের পেলাম হোটেলে উঠে। কাপড় ধোয়া নিষেধ। আর বিছানা চাদর, কম্বল কোনকিছুই খুব পরিষ্কার বলে মনে হল না। কারণ এখানে প্রতিদিন কাচা সম্ভবও নয়। রাতে ও সকালে লাভা শহরটা ঘুরে দেখলাম সবাই মিলে। দেখার মত স্থাপনা বলতে লাভা মনেস্ট্রি। খাবার একটু অন্যরকম। তবে খেতে খুব সমস্যা ছিল না।

লাভা থেকে চার কিলোমিটারের দূরত্ব আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য রিশপ। তার আগে লাভা থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরত্বের অন্যতম পর্যটক আকর্ষণের লোলেগাঁও। রাস্তা বেজায় খারাপ। বেশ ঝুঁকিপূর্ণও কোথাও কোথাও। কিন্তু সবকিছু ভুলিয়ে দেয় কুয়াশাঘেরা ঝাপসা সেই পাইন গাছের সারি।

ভোরের আলোয় আচমকা একরাশ মেঘ এসে গাড়ির জানালা ভেদ করে আলতো করে ছুঁয়ে যায় শরীর। ওহ্ সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। ঝাঁকি খেতে খেতে সকালে যা পেটে পড়েছিল হজম হয়ে গেল প্রায় সব। তাই

লোলেগাঁও পৌঁছে সৌন্দর্য উপভোগের আগে সবাই বসে পড়লাম সুস্বাদু মমো খেতে। এখান থেকে কিনে নেওয়া হল সিকিমে উৎপাদিত বিয়ার। শীতে গা গরম করার জন্য এটা অপরিহার্য।

কপাল ভাল থাকলে লোলেগাঁও থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মেলে। তবে ভাগ্য সহায় ছিল না আমাদের। আশপাশের পাহাড়ি বুনো সৌন্দর্য আর কিলোমিটারখানেক দৈর্ঘ্যের ক্যানোপিতে চড়ে ফিরে গেলাম লাভা। দুপুরের খাবার খেয়ে রওয়ানা দিতে হবে রিশপ। কারও যেন তর সইছিল না।

এর আগে চিন্তা বাড়াল মোবাইল ফোন। কেনা সিমটি তখনও চালু হয়নি। কেউ সংবাদ পাঠাতে পারছে না দেশে। সহকর্মী হুসাইন আজাদ বেশ কাহিল হয়ে পড়ল বাড়িতে খবর না পাঠাতে পেরে। পরে চালক রাজের মোবাইল থেকে কথা বলিয়ে দেওয়া হল তাকে। মোবাইল সিম চালুর আগে তাই দোকানে ভালভাবে কথা বলে নেওয়া ভাল।

বিকেলে আমরা পৌঁছে গেলাম রিশপে। রাস্তা ভাল নয়। তবে মন জুড়িয়ে গেল। সব আশা যেন পূর্ণ হল প্রথম দেখায়। পাহাড়ের কোলঘেঁষে গড়ে উঠেছে গ্রামটি। বসতি কম। পর্যটন কেন্দ্র করেই বসতি– এটা বোঝা যায়। এখানকার প্রধান আকর্ষণ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সুযোগ। পূর্বে ভুটানের উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে ঢালের মত। গ্যাংটক যাওয়া ভিনদেশিদের জন্য সহজ নয়। তাই সে আশা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। জানা গেলো গ্যাংটক খুব দূরে নয় এখান থেকে। আর কিছুটা হলেও দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে।

পাহাড় মানেই চড়াই-উৎরাই। দম আটকানো প্রতিটি পদক্ষেপ। সংগ্রামী জীবন। পাথুরে ঢালে কাছের ঘরে কাটে তাদের জীবন। বিচিত্র ফুলগুলোও সেখানে জীবনের শোভা।

এখানকার প্রতিটি বাড়ির সঙ্গেই রয়েছে একটি করে রিসোর্ট। সব কাঠের তৈরি। বিদ্যুৎ আছে। তবে একবার গেলে দু'দিন আসে না এমনও হয়। নিয়মিত বৃষ্টি হয়। দূর থেকে বাড়িগুলো দেখে মনে হয় সবুজ পাহাড়ে ঝুলছে।

ব্যাগ রেখেই সদলবলে বেরিয়ে গেলাম ঘুরতে। টুটুল ভাই, ভাবি, নিশি আর বাচ্চা দুটিও যে আমাদের পিছ ধরবে বুঝিনি। কারণ আমরা উঠতে চাইলাম রিশপের শিখরে। রাতে বারবিকিউ হবে।

পাহাড়ের এই সুন্দরতম নির্জনতায় আগুনজ্বলা রাতে চিকেন বারবিকিউ। খরচও কম। দেড় কেজি মাত্র ৮শো রুপি। হাতে লাঠি নিয়ে সবাই লেগে পড়লাম ট্রেকিংয়ে। টার্গেট করা হল যতদূর মানুষের পদচিহ্ন আছে ততদূর ওঠা।

ঘণ্টাখানেকে আমরা পৌঁছে গেলাম শীর্ষে। উচ্চতা তখন ৭ হাজার ৩শো ফুট। এত উঁচুতে উঠেও যথারীতি অক্লান্ত সুমেহেরা ও সামি। সন্ধ্যায় ফিরে শিলিগুড়ি থেকে কেনা বছরের প্রথম আমে উদরপূর্তি হল। দোকানপাট এখানে আছে মাত্র একটি। তাও দূরে। বেশিকিছু পাওয়াও যায় না।

ততক্ষণে বারবিকিউয়ের মুরগি হাজির। ঠাণ্ডাও বাড়তে লাগল। কিন্তু বাধ সাধল বৃষ্টি। টানা আধাঘণ্টা তুমুল বৃষ্টি। থামার পর বাইরে বের হয়ে তো চোখ ছানাবড়া। ঘটনা প্রথমে বুঝে ওঠা যায়নি। পুরো চত্বরজুড়ে সাদা আর সাদা। পরে বোঝা গেল তিন চার ইঞ্চি পুরু সাদা স্তর জমে গেছে শিলাবৃষ্টিতে। আরও অবাক হয়েছিলাম সকালে। কারণ অনেক শিলা তখনও গলেনি!

কুয়াশা বাধ সাধায় ভোরের সূর্যোদয় আর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার সাধ মিটল না। যদিও এজন্যই আসা এখানে। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্টে যেন দাঁড়িয়ে থেকেও শান্তি। বাড়িগুলোর বারান্দায় নানা প্রজাতির ফুল। গোলাপগুলো তো ঢাউস সাইজের। আর একেকটি গোলাপগাছ প্রায় ১৫ ফুট লম্বা। এত বড় গাছ দেখা এটাই প্রথম। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাক বা না যাক, এমন সুন্দর, নির্মল পরিবেশে সকালটা উপভোগ করতে পারাও ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু উপভোগের মন থাকা চাই!

জানা গেল এখানকার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস এলাচ চাষ। বড় সাইজের একরকম এলাচ হয় এসব পাহাড়ে। দাম ১৬শো থেকে ২ হাজার রুপি কেজি। গ্রামটির চারপাশ একবার হেঁটে এলেও শান্তি। পরেরবার গেলে একাধিক দিন সেখানে কাটানোয় মত দিল সবাই।

গ্রামটি নিয়ে কিছু কিংবদন্তি চালু আছে। 'রি' শব্দের অর্থ পর্বত শিখরে দাঁড়ানো। আর 'শপ' অর্থ তিব্বতের বহুবর্ষী গাছ।

এখানে সমস্যা শুধু একটি। রাতে রুটি খেতে হবে। সকালেও তাই। সঙ্গে আলুর দম, ডিম। পুরো ট্যুরে খাওয়া নিয়ে ঝামেলা বাধাল নিশি আর সুমেহেরা। বাকিরা ওই দুর্গম এলাকায় এই খাবারেই খুশি। আর একটি কথা বলে রাখা ভাল। এখানে এক থেকে দেড় হাজার রুপি হলেই থাকা-খাওয়া যাবে। সব লজিং সিস্টেম।

পাহাড়ে ঝুলতে থাকা কটেজগুলোর ঝুল বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে মেঘ আর পাহাড় দেখা সত্যি অতুলনীয়। পুরো গ্রামটিতে ৩০-৪০টি বসতি। সবগুলোর সঙ্গে কটেজ। পাহাড়ের গা ঘেঁষে নিচ থেকে পরতে পরতে গড়ে ওঠে বসতিগুলো।

বেশ অতিথিপরায়ণ রিশপের মানুষ। পানি আর শীতের লেপ-কম্বল ঠিকমত পরিষ্কার না করার সমস্যা রয়েছে এখানেও। সঙ্গে নিজেদের চাদর থাকলে ভাল। পরদিন ভোরে রিশপকে বিদায় জানাতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু রওনা দিতে হল কালিম্পং হয়ে দার্জিলিং।

আসিফ আজিজ
তরুণ সাংবাদিক

প্রত্যাখ্যান

অমিতাভ মীর

তোমার মনের দ্বারে বারে বারে,
টোকা দিয়ে ভগ্ন মনে এসেছি কেবল ফিরে!
অজস্র কল মিসড হয়ে ভারাক্রান্ত
করে রেখেছে তোমার ফোন,
ইনবক্স ফুল করে থাকা অসংখ্য সেসব ক্ষুদে বার্তা
পঠিত কিংবা অপঠিত রয়ে গ্যাছে তোমার;
তখনও তুমি অরণ্যের সবুজে বিভোর।
একবারও চেয়ে দ্যাখোনি বিশাল মরুভূমিতে–
একটি অনিন্দ্য মরূদ্যান;
তোমার প্রতীক্ষায় রয়েছে!
ভেবেছিলে, যখন তখন ইচ্ছেমত
একান্ত লুফে নেবার;
তুমি পেয়ে গ্যাছো পূর্ণ স্বাধীনতা ।
এক বিষণ্ন সকালে হঠাৎ বন্ধ দরজা খুলে–
তুমি আমার মরূদ্যানে এসে দাঁড়ালে।
অবিন্যস্ত কেশ, আলুথালু বেশ,
রক্তজবার মত নিদ্রাহীন চোখ,
তোমার সে বেশ দেখে–
চকিতে চমক লেগেছিল বটে, অথচ পারলাম না;
তোমার বাড়ানো হাত দুটি মুঠোয় নিতে।
নিষ্পলক চেয়ে দেখলাম, অবজ্ঞার অপমানে–
তোমার ঠোঁটের রঙ, রক্তিম থেকে ক্রমশ
নীলাভ রঙে রঞ্জিত হল!
তোমাকে প্রত্যাখ্যান কিংবা কিঞ্চিৎ অপমান,
কোনটাই আমি স্বেচ্ছায় করিনি–
কারণ, বুকে ফোঁটা প্রগাঢ় অনুরাগের ফুল,
তোমার বেঁধানো হুলের আঘাতে;
কবেই শুকিয়ে গ্যাছে...!
আর সেদিনই আমি হারিয়েছি-
তোমাকে স্পর্শ করার একান্ত অধিকার।

যোজন কথা

নমিতা চৌধুরী

পুরুষ কি আগুনের ধর্ম জানে
নারীর মতোন
কোন আঁচে পরমান্ন গয়ে ওঠে
কোন আঁচে সুসিদ্ধ তুণ্ডুল
কোন আঁচে নাভিমূল পুড়ে যায়
কিশোরী যেমন জানে
কিশোর জানে কি!

নমিতা চৌধুরী ভারতের কবি

মেগাস্থিনিস বলেছেন

অনীক মাহমুদ

মেগাস্থিনিস আপনি বলেছেন: ভারতবাসীরা যখন-তখন খায়,
একা একা খেতেই ভালবাসে! তবে শত্রুর শস্যক্ষেত্র কখনো নষ্ট করে না।
উচ্ছিন্ন করে না বৃক্ষরাজি!
গাঙ্গেয়গণের চার সহস্র হস্তী যুদ্ধাস্ত্রের অযুত সমাহার,
মহাবীর আলেকজান্ডার সন্ধি করে মৌর্যসাম্রাজ্য করেছেন পরিত্যাগ
আপনার কথিত ভারতীয় সাত জাতির মধ্যে প্রধান পণ্ডিতগণ,
সংখ্যায় নগণ্য মর্যাদায় অনন্য; দ্বিতীয় কৃষকগণ, তৃতীয় গোপাল-মেষপাল
চতুর্থ শিল্পীগণ, পঞ্চম যোদ্ধৃগণ, ষষ্ঠ অমাত্য বা মহাপাত্র, সপ্তম মন্ত্রী;
হতে পারে ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সে পণ্ডিতের অগ্রগণ্য সম্মানের তাজ,
অসামান্য তাঁর ব্রাহ্মণ্যের কোলাজ অতুলনীয়
উত্তরকালের হাজার বছরের প্রবহমান ঐতিহ্যধারায় ব্রাহ্মণকৌলীন্য
কতভাবে ছিল যে উজ্জীবিত, রাজকীয় বিক্রমশীলা বিহারের সাক্ষ্যকলায়
আট সহস্র ভিক্ষুকের সনদসমাবর্তন, মঞ্চে সমাসীন সম্রাট
উপবিষ্ট ভিক্ষুদের সপ্রতিভ স্থাণুর মতন আসনগুলো একটিও নড়ল না;
সবশেষে সংঘাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রবেশ,
সকলেই দণ্ডায়মান সাম্মানিক মহিমায়,
সাক্ষী কাল, সাক্ষী ইতিহাস, সাক্ষী প্রত্যক্ষ ভিক্ষুর নিবেশ
সাক্ষী তিব্বতীয় রাজদূত বিনয়ধর!
মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্রের আত্মার ভেতরে হস্ত প্রসারিত করে
বলেছেন: ভারতীয় পিপীলিকাও বুদ্ধিমান অবশ্য
তবে আর্যান পশু গহ্বরের উপান্তে পশুগুলোর আর্তনাদ
তাঁর কর্ণকুহর স্পর্শ করেছে সহজে!
মেগাস্থিনিস সময়ের রূপকল্পে মগধের বিম্বকথা ইন্ডিকার পরতে পরতে
লিখেছেন: কালসাক্ষ্যের শব্দবল্লরী, দৃশ্যের আড়ালে অদৃশ্য শক্তির
মত্ততায় শব্দভেদী পারিজাত...

স্বীকারোক্তি

শুভংকর সাহা

একবার তুমি নদীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াও–
হাঁটু জল ছাড়িয়ে ডুব দিয়ে আস যেখান থেকে,
সে তো তোমার সীমারেখা, অভ্যাস,
সেই সীমা ভেঙে সাহস করে দাঁড়াতে পারবে
নদীর মাঝখানে!
পশ্চিম আকাশে অংশত দৃশ্যমান যে চাঁদ
সে সাক্ষী থাক–
রাঙা হয়ে ওঠা পুব আকাশের দিকে তুলে ধরতে পারবে
তোমার মুখ?
অন্তত একবার তোমার অস্তিত্বের কাছে
সরল স্বীকারোক্তিটুকু উচ্চারণ করতে পার?

তুমি একবার নদীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াও।

শুভঙ্কর সাহা ভারতের কবি

কথা

শেখর বালা

একটা সময় ছিল
যখন কথা বলতে বলতে
রাত পেরিয়ে সকাল হত
তোমার আমার মোবাইলের ব্যালান্সও ফুরাতো
তবু আমাদের কথা কোনদিনই ফুরাতো না।

আর এখন...
কথা ফুরিয়ে যায় সময় ফুরায় না
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলা সেই আমরা
সময় ফুরানোর জন্য কাঙালের মত
অপেক্ষা করি
দুই মিনিট ফোন রেখে দিলে কেমন দেখায়
তাই তিন মিনিটের জন্য অপেক্ষা করি–
আহারে তিন মিনিট...

বিশ্বজিৎ মণ্ডলের ২টি কবিতা

প্রাজ্ঞপুরুষের প্রোফাইল

রিকোভারির পর আবার ডাকলে ভুল দ্রাঘিমায়

আবার ঢুকে পড়ি– কামসূত্রের অস্থির পৃষ্ঠায়
যেখানে সুচতুর বাৎসায়ন সামলাচ্ছেন
সুনিপুণ শৈলী
ঠিক তখন একদল পাষণ্ড অলীক ফরাস পেতে
সাজাচ্ছে– ভুল অঙ্কের পাণ্ডুলিপি

ঐ তো, কস্তুরী আঁকা সকালে কারা যেন লিখছে
নীল রাত্রির নিষিদ্ধ উল্লাস

পাখি বিক্রেতার প্রোফাইল

তোমাকে বলা হয়নি– এ শহরের সেই পাখিবিক্রেতার কথা

পোস্টমর্টেম ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে
অভিমানে উড়িয়ে দিত সফেদ কবুতর
আমি তখন তোমার ঝাপসা
ডাইরির ভেতর দাঁড়িয়ে
হু হু ভিজে যাচ্ছি আজনবি পর্যটনে

আজও পড়ে আছে হলুদ ঘাম
অদিতি সান্যালকে লেখা সাপের হিসহাস
তুমি তো একুশের সুঠাম সাপিনী

এস গড়িয়ে পড়ি– শঙ্খ-লাগার বিরল মুহূর্তে

বিশ্বজিৎ মণ্ডল ভারতের কবি

বৈসাবীরোদ

মোমিন মেহেদী

সকালের হাতেখড়ি রোদ হয়ে আসে; সীমানার কাঁটাতারে
ঋণের দোসর। ইলিশের রাত কাটে মনুষ্য শখে।
খইমুড়ি সুখ হয়ে ফিরে ফিরে আসে স্বাদ আর সোয়াদের টানে
গানে গানে নীল হয় আমাদের ভোর; দোর খোলে সময়ের হাত।
দাঁতহীন মুখে থাকে আমাদের শাসনমানুষ। শোষকের অন্যায়ে
আঁধারের তোষক হয় বেদনাবিভোর।
নীলাভ ভালবাসায় আদরের রঙ।
সঙ সাজা জীবনের রাস্তায় আঁধারবিরোধী সমাবেশে সুখন পায়ের আওয়াজ।
পায়েলের রিনিঝিনি; নিখাদ দিনের প্রেমে ম্রিয়মাণ চোখ।
চোখের পাতায় আর নাক জুড়ে বদলের হাওয়া।

নববর্ষ

নিদেল শরিফ

কালু সওদাগরের হালখাতার মিষ্টির স্বাদ
এখনো বয়ে আনে অপার স্বাদের সুখ;
রঙিন কাগজে সাজানো দোকান
মাইকে বাজছে ক্রেতাদের নিমন্ত্রণ বার্তা
গদির ওপর লাল হিসাবের খাতা
দেনা চুকিয়ে বের হওয়া বাবার সরল হাসি
এখনো দেখতে পাই–
ডিসির বলি খেলা, ষাঁড়ের লড়াই
লাটিয়ালদের উন্মুক্ত কসরত
বাঁকখালির জলে নৌকাবাইচ
এখনো ফিরিয়ে নেয় অতীতে
ফেলে আসা কোন এক নববর্ষে।

নাগরদোলায় ভীত অথচ উচ্ছল কিশোরীর মুখ
এখনো ভেসে আসে সম্মুখে।
তরুণীর চুড়ির শব্দ শুনতে পাই
এখনো কোন এক বৈশাখী মেলায়
টিএসসির মোড়ে কান পেতে থাকি
যদি আর একবার ডাকো আমায়!
টিভি খুলে দেখি ছায়ানটের মেয়েরা
গান গায় রমনার বটমূলে,
চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রা
সমস্ত অমঙ্গলকে বিদায়ের আশায়–
এখনো প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন হাতে
উত্তাল মিছিলে যায় যুবক;
সকল জরা-জীর্ণ ভুলে
দেশটাকে নতুন করে সাজাবে বলে
প্রত্যেক নববর্ষে।

নববর্ষ // ১

বাংলা নববর্ষ

আমাদের প্রাণের উৎসব

শামসুজ্জামান খান

বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় উৎসব। আমাদের আরও উৎসব আছে। তার কিছু ধর্ম আর কিছু ঋতুকে ঘিরে। আবার একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষা উৎসব। সে উৎসব রাজনৈতিকও বটে । আমাদের তরুণেরা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এই উৎসবের সৃষ্টি করেছেন। বাংলা নববর্ষ উৎসব আর একুশে ফেব্রুয়ারি তাই বাংলাদেশের সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মহান উৎসব।

আজ আমরা আমাদের সব উৎসবের কথা বলব না। শুধু নববর্ষ উৎসবের কথা বলব। বাংলা নববর্ষ উৎসব কখন, কীভাবে শুরু হয়েছে তা ঠিক বলা কঠিন। ইতিহাসেও তেমনভাবে কিছু নেই। তবে প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ বাংলাদেশে 'আমানি' নামে একটি পারিবারিক উৎসব চালু ছিল। প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনগত রাতে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের আগের রাতে বাড়ির গৃহিণী একটি ঘটে পানি ঢেলে তাতে কচি একটি আমপাতার ডাল রেখে দিতেন। আর ঘটে কিছু আতপ চাল ছেড়ে দেওয়া হত।

পহেলা বৈশাখের সকালে সেই আম পাতার ডালটি ঘটের পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি বাড়ির সকলের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হত। আর ঘটে ভেজানো চাল বাড়ির সবাইকে খেতে দেওয়া হত। লোকবিশ্বাস ছিল– এতে সারাবছর সকলের মঙ্গল হবে। গৃহকর্তা এই ভেজা চাল খেয়ে খেতে হাল চাষ করতে যেতেন। মনে করা হত এতে ফসলের কোন অমঙ্গল হবে না। এই বিষয়টি পরবর্তীকালে বাংলা নববর্ষের উৎসবের একটি অংশ হয়ে যায়।

আরেকটি বড় ব্যাপার ছিল– মেলা। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চৈত্র সংক্রান্তির দিনে এবং পহেলা বৈশাখ সকালে মেলা বসত। এই মেলার খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ কৃষিভিত্তিক বাংলায় মানুষের হাতে কাঁচা পয়সা ছিল না। আর কাছে পিঠে এখনকার মত এত দোকানপাটও ছিল না। তাই চটজলদি প্রয়োজনের জিনিসটি কিনে এনে ব্যবহার করাও ছিল কঠিন। তাই প্রতিবছরের গ্রামের মানুষ হাঁড়িকুড়ি, দা-কাঁচি থেকে শুরু করে সংসারের সারাবছরের যাবতীয় দ্রব্যাদি বা তৈজসপত্র এই মেলা থেকেই কিনে রাখত।

এই ছিল গ্রামীণ মেলার আদি উপায়-উপকরণ। আরও পরে ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারি প্রথা চালু করা হয়। জমিদাররা খাজনা আদায়ের জন্য বছরের প্রথম দিনে তাদের বাড়িতে 'পুণ্যাহ' উৎসব করতেন। সেই উৎসবে চাষী-প্রজারা জমিদারির খাজনা পরিশোধ করত এবং মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হত। তখন কিছু ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। অতএব দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস দোকানিরা বেচাবিক্রিও করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে তো নগদ পয়সা ছিল না। তাই তারা বাকিতে দোকান থেকে জিনিস কিনত। কিন্তু এই যে ধারে কেনা জিনিস, এই ধার তো শোধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা তাই বছরের প্রথম দিনে হালখাতা করতেন। সেই হালখাতার দিনে ক্রেতারা দোকানির দেনা পরিশোধ করে যেতেন। দোকানিরা তাদের দোকান সাজাতেন নানান রঙিন কাগজের ঝালর বানিয়ে আর আগরবাতি-ধূপধুনো জ্বালিয়ে। একটা ছিমছাম, ছাপছুতরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ক্রেতা-বিক্রেতার এই সম্মেলন বেশ আনন্দপূর্ণই হত।

এই চারটি উপাদানই ছিল প্রাচীন বাঙালির পহেলা বৈশাখের মূল অঙ্গ। পরে ইতিহাস এগিয়েছে। মোগল বাদশাহরা চালু করলেন ইরানের নববর্ষ উৎসব 'নওরোজ'-এর অনুকরণে উৎসব ও মীনা বাজার। সেও ছিল রাজারাজড়া, অভিজাত ধনী বণিকদের নববর্ষের উৎসব। বাংলা নববর্ষ সেখান থেকেও কিছু প্রেরণা লাভ করেছে। এরও পরে ইংরেজ আমলে এসে কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে ইংরেজদের নববর্ষ উদ্‌যাপনের আদলে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের রীতি চালু হয়। ১৮৯৪ সালে বেশ ঘটা করেই ঠাকুর পরিবারে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। সেই থেকে নগরবাসী শিক্ষিত পরিবারে কলকাতা শহর এবং শান্তিনিকেতনসহ পশ্চিম বাংলার নানা শহরে নববর্ষ উদ্‌যাপনের রীতি চালু হয়।

বাংলাদেশ এই আধুনিক ধারার নববর্ষ চালু হয়েছে ১৯৫০-এর দশকের প্রথম দিকে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন। সেই সময় থেকে ঢাকাসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন শহরে নববর্ষ উৎসব চালু হয়। ঢাকার মাহবুব আলি ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের উদ্যোগে কার্জন হলে নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। তখন *ঐকতান*সহ কয়েকটি সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং ওয়ারির র‍্যাংকিন স্ট্রিটেও এই উৎসবের সূচনা করে। তবে বর্তমানে ঢাকা শহরে নববর্ষের উৎসব যে বর্ণাঢ্য অবয়ব, নব আঙ্গিক ও বিপুল আয়তনে চালু প্রচলিত হয়েছে তার ইতিহাস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের এই জাতীয় উৎসবটি পাকিস্তান সরকার করতে দিতে চাইত না। এই বাধার মুখেই বাঙালি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার বাঙালি তার শিকড় অনুসন্ধান করে নতুনভাবে সাজায় বাংলা নববর্ষের উৎসবকে। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা *ছায়ানট* (১৯৬১)-এর। *ছায়ানট* সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি রমনার বটমূলে ১৯৬৭ সাল থেকে চালু করে নববর্ষের এই উৎসব। এই উৎসব বাঙালির জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত বলেই অতি দ্রুতই তা জনপ্রিয় হয় এবং প্রতিবছরই বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের উৎসব হয়ে ওঠে। নানা রং-বেরংয়ের পাঞ্জাবি-পাজামা-শাড়িতে সজ্জিত বাঙালি পুরুষ-মহিলার বিপুল সমাগমে এই উৎসব এখন বাঙালির সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করেছে। এই উৎসব একসময় গ্রাম থেকে গ্রামে শুরু হয়েছিল কিন্তু পরে আর খুব বড় আকার গ্রহণ করেনি। এখন এই উৎসব গ্রাম থেকে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত হয়ে রাজধানী ছাড়িয়ে বিভাগ, বিভাগ ছাড়িয়ে জেলা, জেলা ছাড়িয়ে উপজেলা এবং গ্রাম পর্যন্ত নব আঙ্গিকে এবং নব সাজে চালু হয়ে গেছে। এই উৎসব বাঙালিজীবনে যে আনন্দ বয়ে আনে তার তুলনা বিরল।

শামসুজ্জামান খান
প্রাবন্ধিক

নববর্ষ // ২

প্রসঙ্গ বাংলা নববর্ষ

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

"রাত্র যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লিঝঙ্কারসুপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।"
– রবীন্দ্রনাথ। 'বর্ষশেষ', *ধর্ম* গ্রন্থ থেকে।

নতুন বছরের আগমনীকে এরকম দৃষ্টিতেই দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কাজী নজরুল ইসলামের একটি গানেও রয়েছে বাংলা নববর্ষের অনুরূপ গূঢ় বার্তা, 'যে মালা নিলে না আমার ফাগুনে/ জ্বালাব তারে তব রূপের আগুনে/ মরণ দিয়া তব চরণ জড়াব হে/ মোর উদাসীন, যেও না ফেলে।'

ছয় ঋতুচক্রে বৈশাখ নির্ধারিত হয়েছে নববর্ষের আবির্ভাবরূপে। রুদ্র বৈশাখ তার তপ্ত চরণ রেখা ফেলে চরাচরে, কাল বৈশাখীর মত্ত ঝাপটা চরাচরকে করে তোলে ক্ষুব্ধ ও মাতাল, দারুণ দহনবেলা যেন ত্রাহি রবে হাহাকারে ভরিয়ে তোলে দিগন্ত; এই মহালগ্নই যেন নতুন বছরের আহ্বান জানিয়ে আমাদের বলে, এই আমি ঝরাপাতার আয়তন মাড়িয়ে এলাম তোমার দ্বারে, আমায় বরণ কর। আম্রমুকুলের গন্ধ অতিক্রান্ত পৃথিবীতে আমি ফুটিয়েছি কত পুষ্প কত ফল, এসবের স্বাদে ও গন্ধে আনন্দিত আহ্লাদিত হয়ে ওঠ। বৎসরের আবর্জনা ধুয়ে মুছে যাক, অশ্রুবাষ্পকে সুদূরে মিলাতে দাও। অগ্নিস্নানে ধরণী শুচি হোক, 'পুরাতন বরষের সাথে/ পুরাতন অপরাধ যত', তা হয়ে উঠুক ক্ষমার্হ।

নতুন বছর যেন প্রাণের উৎসব, নিজেকে নতুন করে নতুন উদ্যোগে জাগিয়ে তোলা। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দেখা যায় নববর্ষ পালনের দেশীয় ঐতিহ্যজাত আবাহনী। ভারতবর্ষে, মিশরে, ইউরোপে, আমেরিকার দেশে দেশে।

নববর্ষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি-বার্ষিক গতির হিসেব ও সালতামামি। প্রাচীন পৃথিবীতে জ্যোতির্বিদ্যার প্রাগ্রসরতা লক্ষ্য করি যে-সব দেশে, সেগুলির মধ্যে মিশর, মোসোপটেমিয়া এবং ভারত অন্যতম। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, নীল নদ আর সিন্ধু-গঙ্গার বাৎসরিক নদীচারিত্র্যের বৈশিষ্ট্য ও নিশ্ছিদ্র ছন্দ কৃষকের চাষবাসকে পরিচালনা করতে ভূমিকা রাখত। হ্যাঁ, চিনের হোয়াংহো নদীর বার্ষিক আবর্তনও কৃষিকাজে সহায়ক ভূমিকা রাখত। এই যে নৈসর্গিক নদীর ছন্দ, তার ফলেই কৃষি, তার জন্যেই সভ্যতা, জাতীয় পর্ব, ধর্মানুষ্ঠান। সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে কৃষিনির্ভর সভ্যতার হাত ধরে। নদীর জোয়ার-ভাটা তাকে উৎসুক ও উদগ্রীব করে তুলল পূর্ণিমা-অমাবস্যার রহস্যমোচনে। বর্ষার গুরুত্ব যেহেতু কৃষিকাজে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তাই আদিম মানুষ ঋতুপর্যায় সবিশেষ অনুধাবনে তৎপর হল। শুরু হল বর্ষপঞ্জি রচনা। প্রাথমিক উদ্দেশ্য কৃষিকাজকে সহায়ক করে তোলা। আর পরবর্তী উদ্দেশ্য জাতিবিশেষের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে সংস্কৃতির যৌগে বাঁধা। সেই অভিপ্রায়ের সূত্র ধরেই নববর্ষের ধ্যান ও ধারণা মানুষের। এবং আদিতে তা ফসল ঘরে তোলার আনন্দ উৎসবকে শিরোধার্য করেই পরিকল্পিত হয়েছিল।

মনুষ্য সভ্যতার আদি থেকেই দেখা যায়, যাবতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের পেছনে ফসল ঘরে তোলার এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তারপর মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনাবৃদ্ধির ফলে অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের মত জ্যোতির্বিদ্যা মানুষকে গ্রহনক্ষত্রের গতি ও কার্যক্রম জানতে শেখাল। পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিকগতি সম্পর্কে অবহিতি ঋতুসমূহের আবর্তন-পুনরাবর্তনের ব্যাখ্যা দিল, আর এর ফলেই গ্রন্থিত হল পঞ্জিকা। উৎসব-অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট এল এরই হাত ধরেই। এল নববর্ষের ধারণাও। দেখা যাচ্ছে, দেশে দেশে নববর্ষ পালন মূলত সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান মেনেই পালিত হয় এবং যুগপৎ এর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে কৃষিজ ফলন।

আমরা প্রাথমিকভাবে বাংলা নববর্ষ নিয়েই আলোচনা করব, যদিও এর পাশাপাশি ভারতবর্ষ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে নববর্ষ পালনের তাৎপর্য, ধারাবাহিকতা ও বৈশিষ্ট্য- বৈচিত্র্য নিয়েও অনুসন্ধিৎসু হব।

বাংলা নববর্ষ

ভারতবর্ষে নববর্ষ পালনের বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে। বাঙালির নববর্ষ পালনও বৈচিত্র্যময়। নববর্ষ এবং অন্যান্য উৎসবানুষ্ঠান আর সামাজিক-ধর্মীয় বিধিনিষেধ বিধৃত হয় যে পঞ্জিকায়, অঞ্চলভেদে তারই তো সংখ্যা প্রায় অনির্ণেয়। এদেশে কমবেশি চল্লিশ রকম পাঁজির ব্যবহার ও প্রচলন। এর মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে পঞ্চাঙ্গ পঞ্জিকার শরণাপন্ন হয় হিন্দু বাঙালির বৃহদংশ। পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ। এই পঞ্চাঙ্গেরও রকমফের আছে, গুপ্ত প্রেস এক বলে তো বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত অন্য, আবার জগজ্জ্যোতির সঙ্গে পি এম বাগচীর সর্বদা মিল হয় না। তবে এ-সব পঞ্জিকা ১লা বৈশাখকেই নববর্ষরূপে মান্য করে। যদিও অতীতে বৈশাখ নয়, নববর্ষ হত অগ্রহায়ণে। কেন এবং কখন থেকে এই পরিবর্তন?

পুরনো বাংলা ছড়াতে দেখি অগ্রহায়ণে বর্ষ শুরুর সমর্থন, ‘ অঘ্রানেতে বছর শুরু নবান্ন হয় মিঠে।/ পৌষেতে আউলি বাউলি ঘরে ঘরে পিঠে। বর্ষ শেষ হত কার্তিক মাসে। এজন্য বাংলার মেয়েদের কার্তিকে পিত্রালয়ে না যাওয়ার বিধান ছিল, – ‘কার্তিক মাস বছরের শেষ, না যেও পিতার দেশ।’

আবার বৈদিক আমলে সম্বৎসরের গোড়ায় রয়েছে মধুমাস, অর্থাৎ বসন্তকাল। সে-যুগে মাসগুলির নাম ছিল মধু, মাধব (বসন্ত), শুক্র, শুচি (গ্রীষ্ম), নভঃ, নভস্য (বর্ষা), ইষ, ঊর্জ (শরৎ), সহঃ, সহস্য (হেমন্ত) তপঃ, তপস্য (শীত)। ষড়ঋতু বৈদিক যুগে থেকেই লক্ষ্যযোগ্য ছিল ভারতবর্ষে। প্রাচীন ভারতে যে শকাব্দ, সেখানেও ১লা চৈত্র থেকে নববর্ষের সূচনা। আমরা পরে দেখব, ভারতের বহুস্থানে আজও ১লা চৈত্রকেই নববর্ষরূপে গণ্য করা হয়।

বরাহমিহিরের *সূর্য সিদ্ধান্ত*, আর্যভট্টের *আর্ধরাত্রিকা*, ব্রহ্মগুপ্তের *খণ্ডখান্দক* হাজার বছরেরও পূর্বে পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রায় নির্ভুল নির্ধারণ করে দেখিয়েছে। অন্যদিকে, খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে ওমর খৈয়ামের মত গণিতজ্ঞ (হ্যাঁ, ইনিই আবার *রুবাইয়াৎ*-রচয়িতা) বার্ষিক গতির আরো অনুপুঙ্খ নির্ঘণ্ট বার করেন, যা পরবর্তীকালে কোপার্নিকাসের গণনার সঙ্গে মিলে যায়।

মেঘনাথ সাহা চৈত্র ও বৈশাখ মাসের দুই নববর্ষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বরাহমিহির ও আর্যভট্টের গণনা ছিল প্রায় নির্ভুল, কিন্তু কিঞ্চিৎ ত্রুটিযুক্ত। বছরে ৩৬৫.০১৬৫৬ দিন করে এগিয়ে আছে হিসেব। তাই ১৪০০ বছরে ২৩.২ দিনে এগিয়ে এসে ১লা বৈশাখ ২২ শে মার্চ আরম্ভ না হয়ে ১৩ই বা ১৪ই এপ্রিল শুরু হচ্ছে। ড. সাহা তাঁর নবশকাব্দের তারিখ তাই পুনরায় ১লা চৈত্র থেকে শুরু করেছেন।

কিন্তু ১লা বৈশাখ নববর্ষ হল কেমন করে? কবে থেকেই বা? আমরা এখন সে-প্রসঙ্গেই যাব।

পয়লা বৈশাখ থেকে নববর্ষ গণনার সূচনা আকবরের। ৯৬৩ হিজরি সনে সম্রাট আকবর দিল্লির মসনদে বসেন। বাংলাদেশ তখন মুঘলদের অধীনে। হিজরি সন হচ্ছে চান্দ্র বৎসর, ৩৫৪ দিনের। এতে করে খাজনা আদায় বিড়ম্বিত হয়, কেন-না হিজরি সনে ঋতুর বৈষম্য ঘটে যায়। তাই নির্দিষ্ট দিনে খাজনা আদায়ে অসুবিধে হয়। হিজরি সন অনুসরণ করলে নির্দিষ্ট মৌসুমে নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ অসম্ভব। সম্রাটের দরবারে কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শে আকবর একটি নতুন সনের প্রবর্তনে আগ্রহী হন। সম্রাটের কাছেও তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল, বিশেষ করে খাজনা আদায়ের দিক থেকে বিচার করে।

এদিকে ভারতীয় বর্ষগণনার অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বছর হল সৌর-পদ্ধতির, কিন্তু মাসগুলি চান্দ্র। আকবর চেয়েছিলেন মাসগুলোকেও সৌর পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে। এখানেও উল্লেখযোগ্য, চান্দ্রমাসকে সৌর বৎসরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ভারতের জ্যোতির্বিদরা মলমাসের নিদান রেখেছিলেন। তাতে বছরের হিসেব শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ দিনেই দাঁড়ায়। কিন্তু আকবরের আদেশে বিজাপুরের সুলতানের প্রাক্তন সভাসদ আমীর উল্লাহ্ শিরাজী নতুন ‘ইলাহী সাল’-এর বাংলা মাসগুলো পারস্য দেশীয় মাসের অনুকরণে সৌরমাসে পরিণত করলেন। আকবর-প্রবর্তিত নতুন বাংলা সনকে আদিতে ‘ইলাহি সাল’ বলা হত, তাঁর প্রবর্তিত ‘দীন-ই ইলাহী’ ধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। একে নামান্তরে বলা হয় ‘ফসলি সাল’, যার সূচনা ৯৬৩ হিজরি। অর্থাৎ বাংলা সনকে ইসলামি সনের সঙ্গে এক করে দেওয়া হল। সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের এক মাস পরের তারিখ থেকে অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল ১৫৫৬ থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনা। খ্রিস্টাব্দের সঙ্গে তাহলে বাংলা সনের সম্পর্কটা দাঁড়াল কীরকম? খ্রিস্টীয় সন থেকে বাংলা সন ৫৯৩ বছর ৩ মাস ১১ দিন কম। আজ পর্যন্ত তা বহাল আছে। কিন্তু ৯৬৩ হিজরি বাংলা ৯৬৩ সন হলেও আজকের হিসেবটা অন্যরকম। এ বছর বাংলা ১৪২৪, কিন্তু হিজরি ১৪৩৯। কেন এমন পার্থক্য? কারণ হিজরি বছর চান্দ্রমাস অনুযায়ী হয় বলে ৩৫৪ দিনে বছর হয়, ইসলামী বছর তাই এই প্রায় ৪৬২ বছরে দুটি ক্যালেন্ডারে ঘটে গিয়েছে ১৬ বছরের পার্থক্য! আকবরের কল্যাণে আমরা একদিকে পহেলা বৈশাখে নববর্ষ পেলাম, অন্য দিকে পেলাম ইংরেজি গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের সঙ্গে সাযুজ্য।

আকবর-প্রবর্তিত বাংলা সন যে দ্রুত জনপ্রিয় এবং গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যপ্রণেতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল* কাব্যেই পাওয়া যায়। ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছে এ কাব্য। কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা শুরু হয়েছে বৈশাখের বিড়ম্বিত জীবন দিয়ে– ‘ভ্যারেণ্ডার খাম ওই আছে মধ্য ঘরে।/ প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥/ বৈশাখে অনলসম বসন্তের খরা।/ তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥/ পা পোড়ায় খরতর রাবির কিরণ।/ শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন ॥/ বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।/ মাংস নাহি খায়-সর্ব্বলোক নিরামিষ ॥’

পহেলা বৈশাখে বাঙালিজীবনে নববর্ষের রথ এগিয়ে চলেছে আজও– জীবনে এবং সাহিত্যে। তাই দেখি *পথের পাঁচালী*তে ইন্দির ঠাকরুন, যিনি কিনা ‘বল্লালী বালাই’, মারা যান বর্ষশুরুর দিন। আগের দিন দুর্গা তাকে চড়কের মেলাফেরৎ মুড়কি আর কদমা দিয়ে গেছে। ইন্দির আশীর্বাদও

করেছে দুর্গাকে, 'রাজরানী হও।' আর পরদিনই মৃত্যু ইন্দিরের। ঘটনাটিকে ঐদিনে নিয়ে এলেন বিভূতিভূষণ, কেন-না 'ইন্দিরা ঠাকরুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।' অতএব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এইভাবে নববর্ষ নিয়ে এলেন লেখক। তবে পুরোপুরি সেকালের অবসান হয়নি নিশ্চিন্দিপুরের, কেন-না গ্রামে রয়েছেন আরো এক বৃদ্ধা, আতুরী বুড়ি। আতুরীর মৃত্যু চৈত্রসংক্রান্তিতে। এইভাবে যে মানুষের মৃত্যুকে ঋতুসংলগ্ন যুগসংলগ্ন করে দেখানো যায়, বিভূতিভূষণের উপন্যাসটি তার চমৎকার নিদর্শন।

বাংলা নববর্ষ নিয়ে ইদানীং মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে। এই দুই দেশে দুটি বিভিন্ন দিনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। বাংলাদেশ ইংরেজি ১৪ই এপ্রিল তারিখটিকে বাংলা নববর্ষের ধ্রুব তারিখ করে নিয়েছে। ১৯৫৮-য় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সেখানকার বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে বাংলা সনের সংস্কার সাধিত হয়। সেটি কার্যকর হয় ১৯৬৮ সাল থেকে। এই সংস্কার কাজে নেতৃত্ব দেন মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সংশোধিত সনের দিন ও মাসপঞ্জী নিম্নরূপ: বৈশাখ থেকে ভাদ্র, এই পাঁচ মাস হবে ৩১ দিনের। আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাসগুলি হবে ৩০ দিনের। আর চৈত্রমাস সাধারণভাবে ৩০ দিনের হলেও চার বছর পরপর অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) হিসেবে ৩১ দিনের হবে। এই অধিবর্ষ হল বাংলা বর্ষপঞ্জীতে নতুন সংযোজন। এইভাবে বাংলা সনকে সৌর বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। এটা যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কিন্তু ভারতবর্ষে এভাবে পঞ্জিকা সংশোধন ঘটেনি। ফলে বৈশাখ থেকে চৈত্র মাসগুলি অসমান। কোনটি ৩২ দিনের, ৩০ দিন কোনটি, আবার ২৯ দিন। দু'দেশের নববর্ষ এক বা দু'দিনের আগে-পরে হয়ে যাচ্ছে। বাংলা তারিখ অনুযায়ী যে অনুষ্ঠানগুলি পালিত হয়, যেমন রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যুদিন ২৫ শে বৈশাখ এবং ২২ শে শ্রাবণ; কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুদিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ এবং ১২ই ভাদ্র; বাংলাদেশে ১লা আষাঢ় বর্ষাবরণের অনুষ্ঠান, ১লা অগ্রহায়ণ এবং ১লা ফাল্গুন যথাক্রমে নবান্ন ও বসন্তবন্দনা যে-দিনগুলোতে উদ্‌যাপিত হয়, বাংলা সে তারিখগুলোর সঙ্গে ভারতবর্ষের তারিখ মেলে না। এই বিভ্রান্তি আশু এড়ানো দরকার।

বিভ্রান্তি তো কেবল বাংলা সন নিয়েই নয়, আছে ইংরেজি বর্ষপঞ্জী নিয়েই। এই অবকাশে সেটা নিয়েও খানিক আলোচনা করা থাক।

ভারতে আকবরের পঞ্জিকা সংস্কারের সমসাময়িককালে ১৫৮২-তে ইউরোপেও পঞ্জিকা সংস্কার করা হয়। এটি করেছিলেন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি। আজ পর্যন্ত এই ক্যালেন্ডারটি মান্যতা পেয়ে আসছে। ইউরোপ-আমেরিকা তো বটেই, পৃথিবীর সর্বত্রই এখন গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের রাজত্ব। এ ক্যালেন্ডারের প্রথম অসঙ্গতি হল, খ্রিস্ট-অব্দ ১ কিন্তু যিশুর আবির্ভাবের দিন নয়। হাস্যকর হলেও সত্যি, যিশুর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব চার (৪)-এ! আবার ইস্টারের কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। ২২শে মার্চ থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫ দিনের মধ্যে যে-কোন দিন হতে পারে। গ্রেগোরির আগে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার ৪৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ৩৬৫ দিনের বর্ষপঞ্জী তৈরি করান। এর পেছনে কার্যকরী ছিল সিজারের মিশর জয়, মিশরীয়দের বর্ষপঞ্জী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল (তখন ইউরোপে ৩০৪ দিনের বৎসরব্যবস্থা চালু ছিল। মাসের সংখ্যা ছিল দশটি)। সিজারকে বর্ষসংস্কারে সাহায্য করেন মিশরের জ্যোতির্বিদ সোসিজেনিস (Sosigenes)। এই বর্ষগণনায় দশের জায়গায় বারো মাসের প্রবর্তন ঘটে। জুলাই মাসটি জুলিয়াস সিজারের নামে, আর সিজারের পরবর্তী সম্রাট অক্টোভিয়াস অগাস্টাসের নামে আগস্ট নাম চিহ্নিত হয়। ১৭৫২ সাল লেগে গিয়েছিল ইংল্যান্ডে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার গৃহীত হতে, তা-ও আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল এ জন্য। ভারতে ব্রিটিশ আমলের সূচনা থেকেই গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রচলন।

গ্রেগোরিপঞ্জীতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, যেমন ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনে, অন্য মাস কখনো ৩০ আর কখনো ৩১ দিনে, এর অবৈজ্ঞানিকতা পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিদদের কাছে ধরা পড়ে। বিশেষ করে এই ক্যালেন্ডার খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের পর্বতারিখগুলোকে প্রচণ্ডরকম বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গুড ফ্রাইডে, পাম সানডে, ক্র্যাশ ওয়েডনেসডে, লো সানডে প্রভৃতি তাই একেবারেই তারিখনির্ভর থাকতে পারছে না। এসব ত্রুটি দূর করবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) একটি বিশ্বপঞ্জীর পরিকল্পনা করেছিল, যা কার্যকর করা যায়নি।

পরিকল্পনাটি নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক। এদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্বৎসরের মেয়াদ ৩৬৫.২৫ দিন হলেও বছরের ৩৬৫তম দিন 'বর্ষশেষ দিন' বলে ধার্য হবে, অর্থাৎ সেটি কোন নির্দিষ্ট বার-নামধারী হবে না। তাহলে প্রত্যেক বছরের প্রতিটি তারিখ এক-ই বারের আওতায় এসে যাবে। ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি রোববার গেছে। সেই অনুযায়ী বছরের শেষ দিনটি, অর্থাৎ ৩১ শে ডিসেম্বরটি হবে রোববার। কিন্তু দিনটিকে রোববার আখ্যা না দিয়ে 'বর্ষশেষ দিন'রূপে আখ্যা দিলে পরের বছরও পয়লা জানুয়ারি রোববার-ই হবে। তাহলে ইংরেজি তারিখের সঙ্গে বারের একটা চিরস্থায়ী ঐক্য নিয়ে আসা যায়। কেবল অধিবর্ষ বা লিপইয়ার জুন মাসের ৩০-এর পরদিন করা হবে এবং সে দিনটিও যদি বারহীন হয়, তাহলে লিপ ইয়ারের সমস্যাও মেটে। আসলে সৌরবৎসরের সঙ্গে মাস ও বারের গোড়া থেকেই অসামঞ্জস্য। এই অসঙ্গতি দূর করার যথাযথ উপায় বার করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের এই উদ্যোগ। এটি অবশ্যই জটিলতামুক্ত সর্বজনগ্রাহ্য বর্ষপঞ্জী হতে পারত।

এ-বর্ষপঞ্জী বা ক্যালেন্ডারের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হচ্ছে বছরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা। প্রত্যেক ভাগের যে তিনটি করে মাস, তা হবে ৩১, ৩০ ও ৩০, এই মোট ৯১ দিনের। অর্থাৎ জানুয়ারি ৩১, আর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ৩০ দিনের এ রকম। তাহলে জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই আর অক্টোবর মাসের আরম্ভ এক-ই বারে হওয়া সম্ভব। সে রকম ফেব্রুয়ারি, মে, আগস্ট আর নভেম্বর এক-ই বারে, এবং মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের সূচনাও একই বারে ফেলা যায়। এমন সপ্তাহ-মাস-বৎসর সাযুজ্য সত্যিই গ্রহণযোগ্য হতে পারত, কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রচুর দেশের আপত্তি এতে। অতএব...

আমরা এখন বাংলা নববর্ষের অপরূপতায় ফিরে যাই আবার। দেখি কী তার মঙ্গল সমাচার।

বাংলা নববর্ষ: পুণ্যাহ থেকে মঙ্গলশোভাযাত্রা

আমরা জানি যে বাংলা নববর্ষকে আকবর নবরূপদান করেছিলেন খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে। এর দীর্ঘদিন বাদে ঔপনিবেশিক আমলে যখন জমিদার-কৃষক সম্পর্কটি প্রায় অহি-নকুলের হয়ে দাঁড়াল, তখন নববর্ষ পেল একটি গালভরা নাম– পুণ্যাহ। প্রজারা বাংলা বছরের প্রথম দিনে খাজনা দিয়ে যাবে জমিদারকে। সেদিন হয়তো জমিদারগৃহে আহারেরও বন্দোবস্ত থাকত। বৃষ্টি খরা দুর্ভিক্ষ যা-ই হোক না কেন, খাজনায় কোন মাফ নেই, যেমন জমিদারকেও কড়ায় গড়ায় সরকারকে দেয় প্রাপ্য মিটিয়ে দিতে হত নির্মম 'Sunset Law' বা সূর্যাস্ত আইন মোতাবেক। নইলে রাতারাতি জমিদার লাটে উঠত। কত জমিদার যে এই আইনের অভিশাপে পড়ে জমিদারি হারিয়েছেন। এই হল মূলত 'পূণ্যাহ' দিবসের মাহাত্ম্য। পরাধীন দেশে এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা করা যায় না।

তবু এরই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, জমিদার রবীন্দ্রনাথ পুণ্যাহকে প্রজাদের পক্ষে প্রকৃত আনন্দময় করে তুলেছিলেন প্রজাদের সঙ্গে একাসনে বসে, আহার করে। জমিদার ও প্রজার প্রকৃত মিলনক্ষেত্রে পরিণত করলেন দিনটিকে কবি। *পঞ্চভূত* গ্রন্থে পুণ্যাহের অভিনব ব্যাখ্যা রয়েছে রবীন্দ্রনাথের। পুণ্যাহে যে বংশীধ্বনি হয়, সে প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, 'খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিনীর কোনো যোগ নেই, খাজাঞ্চিখানা নহবত বাজাইবার কোনো স্থান নহে, কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানে বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আজ আমার পুণ্যদিন, আজ আমাদের রাজা-প্রজার মিলন, জমিদারি কাছারিতেও মানবাত্মা আপন প্রবেশপথ নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও একখানা ভাবের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।'

পরবর্তীকালে ১লা বৈশাখ অন্য আর একভাবে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। তাঁর জন্মদিনটি ২৫শে নয়, ১লা বৈশাখ পালনের সূচনা করেন তিনি।

স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রেই এখন বাংলা নববর্ষ পালনের সমূহ জৌলুশ ও ঘনঘটা। এর সূচনা হয়েছিল কিন্তু পাকিস্তান আমলে 'ছায়ানট' প্রতিষ্ঠানটির হাত ধরে, শ্রদ্ধেয় ওয়াহিদুল হক এবং সন্‌জিদা খাতুনের

উদ্যোগে, রমনার বটমূলে। আজ তা বহু শাখায় তরঙ্গিত হয়ে বাংলাদেশময় ব্যাপ্ত। হালে নববর্ষের দিনটিতে যে পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ যুক্ত হয়েছে, তা কিন্তু গোড়ায় ছিল না। মধ্য-আশি থেকে এর সূচনা, তবে নাচ-গান-আবৃত্তির প্রবাহে বাঙালির সাংস্কৃতিক সত্তাকে উদ্বোধিত করার সঙ্কল্প নিয়েই রমনার বটমূলে নববর্ষ পালন, এখন যা এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। বাঙালির নবচেতনার প্রতীক এখন তা।

এর সঙ্গে সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে যোগ হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে। একেবারেই দেশজ পদ্ধতিতে কাঠ, সোলা ও মাটির মাধ্যমে তৈরি পাখি, বাঘ, হাতি, ঘোড়া, টেপা পুতুল, পালকি, নৌকো, গরুর গাড়ি, পাখা, ঝালর ইত্যাদি বানিয়ে প্রদর্শনী বেরোয়। ব্যাপ্ত বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি জেলায় জেলায় চর্চিত ও প্রশ্রয়প্রাপ্ত, তারই প্রতিনিধিত্ব করে এই 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। নয়ের দশকে এই শোভাযাত্রার সূচনা মূলত শিল্পী ইমদাদ হোসেনের পরিকল্পনামাফিক। এখন কেবল ঢাকাতেই নয়, এর প্রসার ছাড়িয়ে পড়েছে ত্রিশালে নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর চারুকলা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাসহ সমগ্র বাংলাদেশে। মুখোশ, সরার ছবি, ফেস্টুন নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা বেরোয়। এর নান্দনিকতা ও ঐতিহ্য একে রাষ্ট্রসংঘের হেরিটেজের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

বাংলাদেশ বাংলা নববর্ষকে প্রসারিত করে দিয়েছে সেখানকার আদিবাসী সমাজের মধ্যে যেমন, তেমনি সারা বিশ্বে। তাই লন্ডন শহরের বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকা ব্রিকলেন-এ পয়লা বৈশাখ আনন্দের জোয়ার নামে। সেখানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে হয় সাহিত্য উৎসব 'বুকলিট'। হাজার হাজার বাংলাদেশীতে ভরে যায় মাঠ। জার্মানিতেও অনুরূপ চিত্র। প্যারিস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই বাংলা নববর্ষ পালন এক অহংকার।

ভারতের অন্যত্র নববর্ষ পালিত হয় কীভাবে? দেখা যাক এবার।

নববর্ষ: ভারতের নানা রাজ্যে

আদিবাসী জনজীবনে ঋতু, মাস, নববর্ষের ভূমিকা অপরিসীম। প্রসঙ্গত সাঁওতাল সমাজের কথাবলা যায়। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নববর্ষের সঙ্গে তাদের সমাজজীবন যে ওতপ্রোত, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, পরম্পরাক্রমে নতুন বছরের দিনটিতেই তাদের পুরনো গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায় আর নতুন পঞ্চায়েত গঠনের দিন। প্রসঙ্গত, সাঁওতালদের নববর্ষ কিন্তু বৈশাখে নয়, মাঘমাসে। সাঁওতালিদের কাছে মাঘ মাসটি 'রাবাং' নামে পরিচিত। এইদিন একেক গ্রামের মানুষ প্রত্যেকে তাদের স্ব স্ব গ্রামে পূজাস্থান অর্থাৎ 'জীহের'-এ উপস্থিত হন। অনুষ্ঠিত হয় মাঘসীম বা মাঘকুনামী পরব। সারা বছর যাতে গ্রামে সুখশান্তি বজায় থাকে, এই প্রার্থনা করে মারাং বুরু ও অন্যান্য দেবদেবীর পুজো করা হয়। বলি দেওয়া হয় মুরগি।

গ্রামের বাইরে শস্যখেতে ঐদিন সাঁওতালদের আরেক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পূজিত হন 'সাকেত বোঙ্গা' অর্থাৎ সুখ-সমৃদ্ধির দেবতা। এখানেও মুরগিবলি প্রসিদ্ধ। আর যে-কোন উৎসবকে কেন্দ্র করে অন্যান্য আদিবাসী সমাজে যেমন, সাঁওতালদের মধ্যেও তেমনি নাচগানের প্রথা রয়েছে। এর সঙ্গে আরো একটি লোকাচারও পালন করেন সাঁওতালরা। গোরু, মোষ, বলদ, ইত্যাদি গৃহপালিত পশুদের শরীরে নানান চিহ্ন এঁকে দেন এঁরা। নববর্ষ তাই সাঁওতালদের কাছে মানুষ ও পশু নির্বিশেষে উদ্‌যাপিত হওয়ার শুভদিন। আর এ মাসেই যে গ্রামপ্রধান নির্বাচনের প্রথা, তার মধ্যে হয়তো নিহিত আছে শীত তার প্রকৃতিজ জাড়ের প্রভাবে পুরনোকে বিদায় জানায়, আনে আসন্ন বসন্তে নবীনকে আহ্বান করে। বসন্তে সাঁওতালদের বাহা পর্ব, সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই।

ভারতের মত বিশাল দেশে অজস্র ধর্ম-বর্ণ-ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্র ও আশ্চর্য রঙ্গভূমি। তাই প্রদেশে-প্রদেশে নববর্ষের ভিন্ন সুর, ভিন্নতর মাত্রা। পঞ্জাবে দিনটি যেমন 'বৈশাখী' হিসেবে পালিত হয়, তেমনি মারাঠিদের নববর্ষ চৈত্রের গোড়াতে গোড়াতে হয়, যা 'গুড়ি পওয়া' নামে খ্যাত। মারাঠিদের বিশ্বাস, নববর্ষের পুণ্যদিনেই বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছিলেন। পঞ্জাবের যে 'বৈশাখী', তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে শিখ-ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়। এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত জানার অবকাশ রয়েছে।

মধ্যযুগের ভক্ত সাধক ও শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮) একেশ্বরবাদের ওপর ভিত্তি করে যে ধর্মমত গড়ে তোলেন, তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে একে একে নানা শিখগুরুর আবির্ভাব হতে থাকে। গুরু অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, হরগোবিন্দ, হররায়, হরকিষণ, তেগবাহাদুর এবং গোবিন্দ সিং– শিখদের এই দশজন গুরু। ভারতে তখন মোগল রাজত্ব। চতুর্থ গুরু রামদাসের ধর্মবিষয়ে গভীরতা ও কৃচ্ছ্রতায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট আকবর তাঁকে অমৃতসরে যে জমি দান করেছিলেন, সেখানেই নির্মিত হয় শিখদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র অমৃতসর। পরবর্তী সম্রাটরা কিন্তু শিখদের সঙ্গে এই সৌহার্দ বজায় রাখেননি। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হন, কারণ অর্জুন জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করেছিলেন। গুরু অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখদের নিয়ে সামরিক বাহিনি গড়ে তুলেছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে তিনি পাঠানদের স্বদলে আনার চেষ্টা করলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে এবং তিনি প্রথমে বন্দী হন ও পরে সপ্তম শিখগুরু হররায় শাজাহানের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত প্রশ্নে শাহজাদা দারাকে সমর্থন করায় ঔরঙ্গজেব তাঁর শিরশ্ছেদ করেন। পরবর্তী অর্থাৎ নবম গুরু তেগবাহাদুরও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে যখন ঔরঙ্গজেবের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সমালোচনা করেছিলেন, তখন ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দেন। স্বভাবতই তেগবাহাদুরের কাছে তা মর্যাদাহানিকর বিবেচিত হয়েছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁরও শিরশ্ছেদ করেন।

তিন তিনজন শিখগুরুর হত্যা পরবর্তী অর্থাৎ দশম বা শেষ শিখগুরু গোবিন্দ সিংকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি শিখজাতিকে একটি প্রবল প্রতিস্পর্ধীবাধী যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করার শপথ নেন। পিতা তেগবাহাদুরের হত্যা তাই শিখ সামরিক ইতিহাসে নবযুগ আনে। গোবিন্দ সিং শিখদের নিয়ে 'খালসা' বাহিনি গঠন করেন। আদেশ দেন প্রতিটি শিখকে অস্ত্রধারণ করবার। তাছাড়া শিখদের জন্য তিনি পাঁচটি 'ক'-এরও প্রবর্তন করেন। সেগুলি হল– কেশ (লম্বা চুল), কঙ্কতী (চিরুনি), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (খাটো পাজামা) আর কড় (লোহার বালা)। ১৬৯৯ ইংরেজি সালের ১লা বৈশাখ অর্থাৎ নববর্ষের দিনটিতেই 'বৈশাখী' উদ্‌যাপনের মাধ্যমে খালসা বা 'Brotherhood of Saint Soldiers' গঠিত হয়। তাই শিখদের কাছে 'বৈশাখী' তথা নববর্ষের দিনটি অনন্য মাত্রা নিয়ে আসে।

দক্ষিণ ভারতে শকাব্দের প্রথম দিনটিকেই নববর্ষ হিসেবে পালনের রীতি আছে। 'যুগাডি' বলা হয় দিনটিকে। অন্ধ্র, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রেও পয়লা চৈত্র দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। সাতবাহন বংশীয় রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী এই শকাব্দের প্রবর্তক। এখন যে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার পৃথিবীময় মান্যতা পেয়েছে, তার সঙ্গে এই ক্যালেন্ডারের পার্থক্য ৭৮ বছরের। সেই হিসেবে ২০১৮ সাল হল ১৯৪০ শকাব্দ। দক্ষিণ ভারতে বিন্ধ্য এবং কাবেরি নদীতীরস্থ তিনটি রাজ্যে এই নববর্ষ পালিত হয়। এছাড়া রাজস্থান ও সিন্ধু প্রদেশের মানুষও এদিনটিকে নববর্ষের মর্যাদা দিয়েছে। রাজস্থানীদের কাছে দিনটি 'থাপনা' নামে খ্যাত এবং সিন্ধিদের কাছে 'চেতি চাঁদ'। তামিলনাড়ুতে দিনটি হল 'পুথাণ্ডু'। এমনকি মণিপুরেও শকাব্দের প্রভাবে এই দিনটিকে নববর্ষ ধরা হয়ে থাকে। তাঁদের ভাষায় নববর্ষ হল 'সাজিবু সংগমা পানবা'। প্রসঙ্গত, 'উগাডি' শব্দটি অন্ধ্র প্রদেশে ব্যবহৃত হয়, আর কর্ণাটকে এর আলাদা অভিধা রয়েছে– 'বেভু বেল্লা'। ঐদিন অন্ধ্র ও কর্ণাটকে ঘরকে আমপাতার মালা দিয়ে সজ্জিত করার রেওয়াজ। সিদ্ধিদাতা গণেশ আম্রপল্লবপ্রিয় (আম পাতা নয় কেবল, এই পুণ্য দিনটিতে তালমিছরি, কাঁচা আম, তেঁতুল, নিমফুল, লবণ আর কাঁচা লঙ্কার সমাহার ঘটানো হয়, যার বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাদ শৈশব থেকে বার্ধক্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। আম্রপত্র 'থোরানা' বড় পবিত্র দক্ষিণীদের কাছে, এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীমাত্রেরই কাছে। যে-কোন উৎসবে আম্রপল্লব ব্যবহৃত হতে দেখা যায় তাই। এমনকি বৌদ্ধদের কাছেও এই ফলটি পবিত্র, সম্ভবত বুদ্ধদেবের জন্ম বৈশাখে বলেই। তাঁর আবির্ভাবের দিনটিতে ভক্তরা তাঁকে আম্রফল নিবেদন করে থাকেন। জাতকের একটি কাহিনির নাম হল 'আম্রজাতক'।

কিংবদন্তী অনুসারে 'যুগাদি' বা যুগ আদি চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াণ ও সেই সঙ্গে দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে কলিযুগের আবির্ভাবে। ইতিহাস, মিথ ও যুগ যুগ ধরে চলে আসা লোকাচারের পরম্পরাগত ঐতিহ্য বহন করে টিঁকে

আছে বিভিন্ন স্থানিক নববর্ষের উদ্‌যাপিত ক্রিয়াকলাপ।

তামিলনাড়ুতে যে নববর্ষ পালিত হয়, তা কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশের 'উগাদি' পালনের মত চৈত্রমাসে হয় না। হয় বৈশাখ মাসে। 'পুথাণ্ডু' নামে এই নববর্ষ তামিলনাড়ু ছাড়া শ্রীলঙ্কাতেও তামিলভাষীদের মধ্যে পালিত হয়। মালয়ালমভাষী কেরালাও বৈশাখে তাদের নববর্ষ পালন করে, যার নাম 'বিষু'। অর্থ, সমান। কীসের সমান? এসময় সূর্য নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম করে বলে দিন ও রাত্রির পরিমাপ সমান থাকে। কেরালায় দিনটি উদ্‌যাপিত হয় কেরলবাসীর নিজস্ব প্রথায়। 'কানি কানাল' নামে এই লোকাচারটি পালিত হয় বাড়িতে এবং মন্দিরে। কথাটির অর্থ হল, 'প্রথম দর্শন'। এই দিনে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই শুভ কিছু বস্তু দেখলে সারা বছর সুখ-সমৃদ্ধিতে কাটবে বলে কেরলবাসীদের বিশ্বাস। কী কী জিনিস? শাদা কাপড়, স্বর্ণালঙ্কার, গন্ধপুষ্প, বই, নারকেল ও কুমড়ো। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে ঘুম ভাঙিয়ে চোখ বোজা অবস্থায় এসবে সজ্জিত থালার সামনে নিয়ে আসা হয় এই মাঙ্গলিক বস্তুনিচয় দেখানোর জন্য। কেরলে ঐদিন শিশুকিশোরদের হাতে কিছু পয়সাকড়ি দেবার রীতি আছে। প্রথাটির নাম 'বিষু কাইনিকম।' আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালিদের মধ্যেও কিন্তু প্রথাটি আছে, যাকে বলে, 'থৌল খরচ।' থৌল' বা 'থোল' কথাটির অর্থ 'অল্প', কিয়ৎ পরিমাণ। ছোটদের দেওয়া হবে, তা কি খুব বেশি পরিমাণে দেওয়া কাম্য? তাছাড়া তাদের খরচের অবকাশও তো অল্পই হয়ে থাকে। সেজন্যই থৌল খরচ।

নববর্ষে প্রায় সবাই নতুন বস্ত্রে সজ্জিত হয়, ভারতের প্রায় সব রাজ্যে। আর এ-উপলক্ষ্যে মেলাও অনুষ্ঠিত হয়, বসে গান-বাজনার আসর, নৃত্যানুষ্ঠান। বাজিও পোড়ানো হয়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে।

মহারাষ্ট্রে যে নববর্ষ ঐতিহ্যিকভাবে পালিত হয় অন্ধ্র ও কর্ণাটকের 'যুগাদি'র দিনেই, সে অনুষ্ঠানের অপর একটি নাম রয়েছে– গুড়ি পাদোয়া (Gudi Padwa)। মারাঠী বিশ্বাস, ব্রহ্মা এই দিনটিতে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে ঐদিন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন বলেও বিশ্বাস অনেকের। সে যাই হোক, একই দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু (অধুনা চেন্নাই) আর কেরালায় নববর্ষ পালিত হচ্ছে বৈশাখে আবার অন্ধ্র আর মহারাষ্ট্রে চৈত্র মাসে, এটা বেশ অদ্ভুত লাগে। অন্ধ্র-সংলগ্ন ওড়িশায় যে নববর্ষ তার নাম 'মহাবিষুব সংক্রান্তি।' এটিও অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসে। এ দিনটিকে 'পান সংক্রান্তি'ও বলে, কারণ বহুবিধ ফলের রস ও দই খেয়ে উদ্‌যাপিত হয় দিনটি। হনুমান পুজো করেন ওড়িশাবাসী ঐ দিনে, সমুদ্র-বেষ্টিত রাজ্যটি যাতে ঝড়জল থেকে রক্ষা পায়।

একদা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। ব্রহ্মদেশ বা বর্মা (বর্তমান মায়ানমার), আনাম (বর্তমান ভিয়েতনাম), শ্যামদেশ (থাইল্যান্ড), মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) ইত্যাদি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচিত হওয়ার ফলে এসব দেশে বহুবিধ ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির ব্যাপক অনুসরণ ঘটে।'জাতক', 'কথাসরিৎসাগর' এবং আরো বহু গ্রন্থে এসব দেশের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের খবর পাওয়া যায়। এসব দেশের কোথাও কোথাও ভারতের রাজনৈতিক প্রভুত্বও স্থাপিত হয়েছিল, যার স্থায়িত্বকাল ছিল হাজার বছরেরও বেশি। কম্বোজ বা কম্বোডিয়া ছিল, এরকম একটি দেশ, যার রাজধানী যশোধরপুর সম্পর্কে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'It was one of the grandest cities in the whole world in that age.'(An Advanced History of India)। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে হাজার বছরেরও বেশি এদেশে ভারতীয়রা রাজত্ব করেছে, গড়েছে আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দিরসহ আরো বহু স্থাপত্য। তেমনি ভিয়েতনামের একটি অংশ নিয়ে যে চম্পা রাজ্য গড়ে ওঠে, সেখানে শ্রীমার নামে জনৈক ভারতীয় রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা। মালয় উপদ্বীপের শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যও ভারতীয়দের দ্বারা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন বাঙালি, নাম কুমার ঘোষ। সে-দেশের রাজা বালপুত্রদেব পালরাজ দেবপালের অনুমতিক্রমে নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য রূপে চিহ্নিত বরোবুদুর স্তূপ এখানেই অবস্থিত।

নববর্ষ প্রসঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এইসব দেশ নিয়ে আলোচনার হেতু হল, এ-সব দেশে আজও কিন্তু ঐতিহ্য মেনে ভারতীয়মতেই নববর্ষ পালিত হয়ে থাকে। বর্মা, কম্বোডিয়া, লাওস এবং অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর দেশে দিনটি 'সংক্রান'রূপে পালিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের মধ্যেও দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। মায়ানমারে দিবসটি Thingyan নামে পরিচিতি, যার অর্থ জলক্রীড়া। এই দিনটিতে ওখানে জলখেলা প্রশস্ত তো বটেই, কম্বোডিয়া-থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে হাতি শুঁড়ে করে জল ছেটায়, এবং সে-জল দিয়ে নিজেকে সিঞ্চিত করে তোলা সাংবাৎসরিক সৌভাগ্যের লক্ষণ। তাই দেখা যাচ্ছে, নববর্ষের সূত্র ধরে বৃহত্তর ভারতের ঐতিহ্য এখনো ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে।

যেমন আরো এক সমান্তরাল ধারা নওরোজের। ২০ বা ২১শে মার্চ দিনটি ইরানে পালিত হত। ইরান আবার এটি নিয়েছিল সুমেরীয় সভ্যতা থেকে। ভারতে মুঘল আমলে বাদশাহরা একে রাজকীয় মর্যাদা দিলেন। এখনো আফগানিস্তান, পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চল, মধ্য এশিয়ায় এই পর্বটি অত্যন্ত পবিত্রতার সঙ্গে পালন করা হয়। পারস্য বা ইরানে এ-উৎসবটি তিন হাজার বছরেরও অধিক প্রাচীন। ২০১০-এ রাষ্ট্রসংঘ উৎসবটিকে ঐতিহ্যিক স্বীকৃতি জানায়। নববর্ষ আর বসন্তোৎসবের দ্বৈত মাধুর্যে দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। ইরানীয়রা ঐ দিন তাঁদের পূর্ব পুরুষদের আত্মাকে অভ্যর্থনা জানান। এজন্য ঘরদোর পরিচ্ছন্ন করে তোলা বিধি। নতুন জামা-কাপড় পরে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবসহ আহারে বসেন তাঁরা। খাবার টেবিলের সরঞ্জাম সাজানো হয় প্রাচীন পদ্ধতিতে, যাকে বলে 'হ্যাফ্‌ট সিন'। জেন্দ আবেস্তার ভাষায় 'নওরোজ' কথাটির অর্থ 'নতুন দিন' বা 'দিনের আলো।' প্রাচীন ইরানীয়দের বিশ্বাস ছিল, এইদিন তাঁদের ঈশ্বর আহুর মাজদা পৃথিবীতে নেমে আসবেন মানুষের মধ্যে নিচতা, ক্ষুদ্রতা দূর করে দিয়ে তার মধ্যে চিরন্তন শুভবোধ জাগাতে। পৃথিবীতে কুৎসিত বলে কিছু থাকবে না, থাকবে না বুভুক্ষা অসুন্দর, আর কেউ-ই অসুখীও থাকবে না। এই অত্যাশ্চর্য সংঘটনকে প্রাচীন ইরানীয়রা 'রাস্তাখিজ' নামে অভিহিত করেন, যাকে পুনর্জাগরণ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। বলা হয়, ইরানীয় শাসক জামশেদ এই উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। আহুর মাজদার নামে এদিন মদ্যপানেরও আয়োজন থাকে। কিংবদন্তী যে, স্বয়ং জামশেদ ছিলেন মদ্য প্রস্তুতির দক্ষ একজন কারিগর।

ইরান ও ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে আর্যদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনকারী দুটি দেশ। অতএব আর্যদের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, তার সমান্তরালতা দু'দেশেই দেখা যায়। কিন্তু নববর্ষের প্রশ্নে অর্থাৎ ঋতুগত প্রশ্নে ভারতীয় আর্যরা কিন্তু শরৎকেই বেশি পরিমাণে মর্যাদা দিয়েছিন। 'কুর্বেন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেস্থতং সমাঃ' অর্থাৎ কাজ করতে করতে শত শরৎ বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা করবে, বা 'জীবেম শরদঃ শতম্' (যেন শত শরতের আয়ু লাভ করি), উপনিষদের এই উক্তির মধ্য দিয়ে শরৎকালের প্রতি ভারতীয় আর্যদের সম্ভ্রান্ত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষের পাশের দেশ তিব্বত। এদেশের নববর্ষ পালন 'লোসার' নামে পরিচিত। তিনদিন ধরে তিব্বতীরা নববর্ষ উৎসবে মেতে থাকেন। সেখানকার পোতালা প্রাসাদের মন্দিরের দেবীকে উৎসর্গ করা হয় বিশেষ এক ধরনের পিঠে যার নাম 'তোরমা।' যখন দালাই লামা থাকতেন, সে-সময় এই দিনে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ভক্তরা মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা জানাতেন। দীর্ঘদিন ধরে দালাই লামা ভারতে নির্বাসিত। তবে এই লোসার পরে কেবল তিব্বতেই নয়, ভারতের বহু বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চল যেমন লাদাখ, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম অঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। লাদাখ ও অন্যত্র দেখা যায় এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে পূর্ব পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সমাধিস্থলে প্রদীপ জ্বালানোর মত প্রয়াতদের স্মরণ ও অর্চনা লোসারের আবশ্যকীয় অঙ্গ। অল্পবয়সীরা মুখোশ পরে আনন্দ করে আর তাদের পোশাক রঞ্জিত হয় পশুর অবয়বে। এই উৎসব দু'সপ্তাহ ধরে প্রলম্বিত হতেও দেখা যায় কোথাও কোথাও। ভুটান আর নেপালেও এই 'লোসার' (লো= বছর, আর সার = নতুন) এক অতি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। নেপালে এছাড়া 'বৈশাখী'ও উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমটি পালন করে বৌদ্ধরা, আর দ্বিতীয়টি সেখানকার হিন্দুরা। নেপালে আবার এর অন্যতর বৈচিত্র্য রয়েছে। গুরুং সম্প্রদায় পালন করে থাকেন 'টোলো লোসার', 'সোনাম লোসার' টামাং জনগোষ্ঠীর, আর 'গিয়ালপো লোসার' হল শেরপা ও ভুটানিদের যাপিত উৎসব। প্রথমটি ডিসেম্বরে, দ্বিতীয়টি ফেব্রুয়ারি ও

তৃতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় মার্চে। তাই নেপালের 'লোসার' উৎসবকে পুরোপুরি নববর্ষ উৎসব বলে সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

তিব্বতের 'লোসার' উৎসবের বৈশিষ্ট্য হল, এ সময় বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বৌদ্ধধর্মের নানা বিষয় নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন। আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে, সুদূর অতীতে এরকমই বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন হয়তো বাঙালি পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা তাঁরও পূর্বে তিব্বতে যে-দু'জন বাঙালি বৌদ্ধ পণ্ডিত গিয়েছিলেন, সেই শান্তরক্ষিত ও কমলশীল!

ভারতবর্ষে এবং তার প্রতিবেশী দেশসমূহে যে নববর্ষের আলোচনা এতক্ষণ করা গেল, সেখানে শ্রীলঙ্কা নিয়ে আলোকপাতও জরুরি। আমরা জেনেছি যে চেন্নাইয়ে যে নববর্ষ পালিত হয়, যা 'পুথাণ্ডু' নামে পরিচিত, তা তামিলভাষী শ্রীলঙ্কাবাসীরাও পালন করে থাকেন। সেখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় বৌদ্ধ পঞ্জিকানির্ভর 'বাক' মাসে নববর্ষ পালন করেন। 'নোনাগাথে' অর্থাৎ পুরনো ও নতুন বছরের মধ্যবর্তী একটি নিরপেক্ষ সময় কল্পিত হয়েছে, একমাত্র দেব-আরাধনা ছাড়া সবকিছুই তখন নিষিদ্ধ। আগে কোকিলের ডাক শুনে নববর্ষের শুভক্ষণটি ঠিক করা হত। কিন্তু এখন জ্যোতিষবচনই একমাত্র গ্রাহ্য। এই দিনটিকে বলা হয় 'অলুখ অউ রুডু'। সেদিন ভেরী বাজিয়ে আহ্বান করা হয় নতুন বছরকে। সেই 'রাবান' বা ভেরীর শব্দ নতুন বছরের নতুন দিনটিকে নবতর মাত্রা দেয়। অশোকের অনুশাসনে যে রয়েছে 'ভেরী ঘোসো অহো ধম্মো খোসো', এ যেন তারই চিরায়ত ও শাশ্বত অনুরণন।

নববর্ষকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচিত্র সব প্রথা পালিত হওয়ার প্রচলন রয়েছে। এশীয় ভূখণ্ডে তা এক রকম, ইউরোপে অন্য রকম। বালি ও জাভায় যেমন দিনটি নীরবতা পালনের দিন, আর পুজো-আচ্চা, উপোস ইত্যাদির মাধ্যমে পালন করা হয় দিনটিকে। বিমানবন্দর বন্ধ থাকে বালিতে, রোগী বহন করা ছাড়া গাড়ি চলাচলও নিষেধ। অন্যদিকে ফরাসিরা এই দিনে (স্বভাবতই ১লা জানুয়ারি) বাড়িতে সঞ্চিত যাবতীয় মদ খেয়ে শেষ করে (বছরের শেষ দিনে, অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর। পুরনো মদ গৃহস্থের সৌভাগ্যনাশকারী, এই বিশ্বাস থেকেই এরকম করা হয়)। অন্যদিকে গ্রিসদেশে নববর্ষ ১লা নয়, পালিত হয় ২রা জানুয়ারি, সেন্ট বেসিল (৩৩০-৩৭৯ খ্রিস্টাব্দ)-এর প্রতি শ্রদ্ধায়। পূর্ব ইউরোপে স্বয়ং যিশুর পরে এঁর মান্যতা সর্বাধিক, যাঁর নামে বিখ্যাত গির্জা রয়েছে মস্কোতে। খ্রিস্টধর্মে পরম বিশ্বাসী এই সন্ত বলেছিলেন, 'Beside each believer stands an Angel as protector and shepherd, leading him to life.' গ্রিসে এদিন একটি রুটি প্রস্তুত হয়, ভিতরে মুদ্রা থাকে। যার ভাগ্যে সেই মুদ্রা লাভ ঘটে, বছরভর সুখসমৃদ্ধিতে কাটবে তার, এরকমই বিশ্বাস মানুষের। বলাবাহুল্য, এগুলো সবই সংস্কারের পর্যায়ে পড়ে। যেমন স্পেনবাসীদের নববর্ষের পূর্ব রাতে বারোটি আঙুর খেয়ে নেওয়া রীতি। জার্মানরা একপাত্র জলের মধ্যে গলানো সিসা ঢেলে নিয়ে পরখ করে, সিসা কেমন আকার নেয়। তা দেখে তারা বছরের ভাল মন্দের সালতামামি করে।

দেশে দেশে এমন সব লোকাচার নববর্ষের সঙ্গে যুক্ত হলেও দিনটিকে আনন্দমুখর করে কাটানোর অভীপ্সা সব দেশেই দেখা যায়। কার্নিভাল, মেলা, নাচ-গান হই-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়া, নতুন পোশাক পরা, এই হল নববর্ষ পালনের সাধারণ রীতি। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই নিজ নিজ ঐতিহ্যে পালিত নববর্ষ পালনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১লা জানুয়ারির নববর্ষ পালন অনুষ্ঠান। সমগ্র বিশ্বের অনুমত যে গ্রেগোরিয়ান বর্ষপঞ্জী, তার ওপর ভিত্তি করেই মূলত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিয়াকলাপ চলে। তাই স্বভাবতই ১লা জানুয়ারির ভূমিকা সর্বাতিশায়ী হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষ তথা এই উপমহাদেশ যেহেতু প্রায় দুশো বছর ইংরেজদের অধীনে ছিল, তাই ইংরেজি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, পোশাক-আশাক, খাদ্য-পানীয় যেমন অনুসৃত হয়ে গেছে, তেমনি বড়দিন, রোববারের ছুটি, ১লা জানুয়ারি নববর্ষ উদ্‌যাপনও উপমহাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। একদা ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতায় ইংরেজদের নববর্ষ পালনের ছবি ধরা পড়েছে *হুতোম প্যাঁচার নকশায়*, 'ইংরেজরা নিউ ইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীতে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরন করে ন্যান– নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরানকে বিদায় দেন।' এরই পাশাপাশি ছাপোষা বাঙালির করুণ নববর্ষ-উৎসব পালনের ছবিও রয়েছে, 'বাঙালীরা বছরটি ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হোক, সজনেখাঁড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্যি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে পুরানকে বিদায় দেন। কেবল কলসি উচ্ছগ্‌গুকর্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাতেও ইংরেজের নববর্ষের বাঙ্ময় চিত্র। তিনি লিখছেন, 'নিরন্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম।/ বিলাতীর শকে আসি করিলা আশ্রম ॥/ খৃস্টমতে নববর্ষ অতি মনোরম।/ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর ॥' তিনি আরো লিখছেন, 'নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরেজটোলায়।/ দেখে আসিওরে মন আয় আয় আয় ॥/ শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।/ কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর ॥' তবে কী নববর্ষ, কী বৈশাখের আগমনী, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাঙালি তার পরম অনভূতির মন্ত্রস্পর্শ লাভ করে। তাই তাঁর কথা দিয়েই আমরা বর্তমান নিবন্ধ শেষ করব।

'যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।'

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ভারতের কবি, কথাসাহিত্যিক

নববর্ষ // ৩

এসো বৈশাখ, রাজসমারোহে এসো

জামিরুল ইসলাম শরীফ

একটি নিঃশ্বাসে ছুঁয়ে আরেকটি নিঃশ্বাসের মতই দ্রুতগতিতে কেটে গেল জীবনের আরো একটি বছর। এক বৈশাখ থেকে আরেক বৈশাখে পৌঁছে গেলাম আমরা। বিশ্ব পঞ্জিকায় মহাকালের গর্ভে বর্ষচক্র ঘুরে এল আরেক পাক। বাঙালির সেই বর্ষচক্র শুরুর মাস বৈশাখ। বসন্তের পর উষ্ণ হতে থাকে দিন। উষ্ণের উৎপীড়নে শুষ্ক হয় মাটি। গ্রীষ্মের জ্বরতপ্ত সূর্যের মূর্ছায় কাঁপে প্রতিটি প্রহর। স্নেহের উষ্ণতায় জড়িয়ে থাকে মন। দুরন্ত দুঃখের তাপে দগ্ধ প্রকৃতি। গ্রীষ্মের তাপদাহে বিষাদ ঠেকে সে দীপ্র-দীর্ঘদিন। দিনব্যাপী শ্রমের স্বাক্ষরে ন্যুজপীঠ খোঁজে শয্যার আশ্রয়। গ্রীষ্ম-বসন্তের মেলবন্ধন আর ঝরাপাতা-কচিপাতার মিলন ঘটিয়েছিল যে চৈত্র তাকে এবার বিদায়। চৈত্র প্রখর কিন্তু রূপসী ভারী, বৈশাখ রোমান্টিক অথচ বিষাদময়ী। চৈতালী ঘূর্ণি কালবৈশাখের অগ্রদূত, মেঘলোকের যুবরাজ। তুফানে ঝাপট ভারী, শোণিতে প্লাবন জাগায়, রহস্যময় হৃদয়ের বিদ্যুৎ-জ্বালায় চোখের ঝলকে অসীমেরে মারে টান; এলে কি জাগাতে ত্রাস জীবনের অবোধ উৎসবে বিকট ভঙ্গিমা নিয়ে? দুর্বার লালসার অন্ধ তেজ অকস্মাৎ হানে অনুকম্পায়ী ত্রাসে!

ঋতুরাজ বসন্ত গেল প্রখর চৈত্রে ধুলো উড়িয়ে। গ্রামীণ ধুলোর ঘূর্ণি আর কংক্রিটের শহরে, ধাতু আর পাথরের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির আলেখ্য সঞ্চারে বাঙালি ছেড়ে যাচ্ছে তার বারো মাসের পার্থিব ইস্টিশন।

দিনগত পাপক্ষয়ে ব্যস্ত, বিব্রত, উদ্বিগ্ন মানুষের কানে এসে লাগছে যৌবনাদ বৈশাখের ব্রজনির্ঘোষ। বাংলা বর্ষচক্র শুরুর মাস বৈশাখ। প্রাচীন ভারতীয় চান্দ্রপঞ্জিকা অনুসারে বাংলা বছরের বারো মাস ছয় ঋতুতে বিভক্ত। বাংলার কাব্য-কাহিনিতে, গানে-গাথায়, বীজবপন আর লোকশিল্পে নিবিড় হয়ে আছে এই ছয় ঋতু। ঋতুর বৈশিষ্ট্যে আর প্রকৃতির বৈচিত্র্যে অনন্যনির্ভর আমাদের বাংলাদেশ। আমি যে জন্মেছি, বড় হয়েছি এই নদীলালিত ভূখণ্ডে। কিন্তু বাঙলা নিয়ে বাংলার অস্বস্তি আমার কাটছে না। ভাষার ধ্বনি-বৈচিত্র্যে তার পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বানানরীতির যে পরিবর্তন আসুক না কেন 'বাঙলা' কথ্যভঙ্গির শিষ্ট ও সর্বজনবোধ্য রূপটি সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও জীবন্ত লাগে। অর্থাৎ বাঙলা শব্দের বানান 'ঙ' দিয়ে করাটা সঙ্গত ও সমীচীন মনে হয়। 'ং' একটি অর্ধস্বর, কোন বর্ণের বা কারের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। ঙ-একটি সম্পূর্ণ স্বর অর্থাৎ তার একটি পৃথক স্বর-সত্তা আছে। সে অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এমনকি রূপের প্রাধান্যে 'ঙ' চিরদিন অক্ষুণ্ণ একটি স্বর-সত্তা, যেখানে সে া-(আ) কার ে-(এ) কার ৈ-(ওই) কারের দ্বারা প্রস্ফুট কি-বিস্তার হয়ে থাকে। ঙ(উঁয়া) বহুদিন বাঙলা ভাষায় অবহেলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ঙ-কে স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে বাঙালি, ভাঙা, রাঙা এভাবে লিখলেন। আর ঙ-দিয়ে লিখলে 'বাঙলা' শব্দটি স্বাবলম্বী এবং বেশ ভরাট লাগে, ং-এ বাংলায় কেমন ন্যাংটো দেখায়। ঙ-দিয়ে 'বাঙালি'/'বাঙালি'র পরিচয় স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ও ধ্বনির অর্থগৌরবে অসামান্য লাগে। তাই 'বাংলা' নয়, 'বাঙলা' তার ধ্বনি-মাধুর্যে, স্বর-সংগীতে, প্রকৃতি-পরিবেশের অর্থগৌরবে প্রাণ প্রতিষ্ঠায় ফিরে আসুক 'বাঙলাদেশ' এই চাই।

বাঙলার সমাজসভ্যতায় বাঙালির নববর্ষ উত্থাপন তার জাতি ও রাষ্ট্রগত সংস্কৃতিরই পরিচয়। পহেলা বৈশাখ তার বর্ষশুরুর সঞ্জীবনী মন্ত্র। তাই বর্ষ আবাহনে পাওয়া না-পাওয়ার বিচ্ছেদ-বেদনার হিসাব মেলাতে হবে স্বভাবতই। জীবনের যাবতীয় বন্দর ছুঁয়ে আমরা যে গন্তব্যেই পাড়ি জমাই না কেন, মানবচিত্তে পূর্ণ বিকশিত হতে না পারলে মুক্তি নেই। জীবনের যত বিপত্তি, রোগ, তাপ, শোক, জৌলুশ, উন্মত্ততা, অভাব, অন্ধতা আমরা অবাক, অসহায় চোখে চেয়ে দেখি, তার কেন্দ্রে আছে মোহ, ভোগ, উদ্বাস্তু মনের, এমনকি দেহের আঁস্তাকুড়ে আত্মাকে অবরুদ্ধ করার অভিলাষ। ক্ষুধা আর প্রবৃত্তির উপরে রিরংসা আর উন্মত্ত অসংযম ছাড়া মানুষের অন্য কোন ব্যাধি নেই। ব্যক্তির যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা, নিভৃত সত্তার বেদনা কমবেশি মূল কথা সবার আছে। 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে'– এ বেদনা যেমন আধুনিক মানুষেরই বেদনা। আলো নিবে যায় এ তথ্যে নেই আধুনিকতা। তেমনি বারবার আলো জ্বালাতে চাওয়ার মধ্যে আছে অদম্য সত্তার মুক্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণার সংকল্প। মনুষ্যত্ব ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে মানুষের আত্মরক্ষার অবচেতন বাসনা ছাড়া আর কী? অতি ভারী গ্রন্থবিলাস পাণ্ডিত্য ও অশিক্ষিত পটুত্বসম্পন্ন, ভাসা ভাসা, বিভ্রান্তিকর এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিরক্তির সৃষ্টির করে। বিশ্বের সমস্যার সমাধান সম্ভব মানুষের আত্মিক উন্নয়নের সূত্রে। এই আত্মিক উন্নয়ন তাকে এক সুমহান চেতনার উপলব্ধিতে সহায়তা করবে। সেই উপলব্ধি তাকে মানবিক চেতনায় অতিমানব তৈরি করবে। গোটা সমাজকে আত্মীকরণের (spiritualisation) পক্ষপাতী প্রাজ্ঞজন, বিজ্ঞানী, মরমীসাধক, কবিরাই। চিন্তাবিদ, শিক্ষাব্রতী, কবি, সাংস্কৃতিক জগতের এক একটি আলোক স্তম্ভ একে একে নিভে গেলেও বাঙালির গৌরবের দিন ফুরোয়নি। একেকজন নাক্ষত্রিক উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান আমাদের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, উৎসবের পর্বে পর্বে আলোকশিখার প্রতিনিধিরূপে এসেছেন। পুনশ্চ উজ্জীবনে আমরা স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। অর্থাৎ বাঙালি তার ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যে কেবল বাড়েই, কমে না। যুগান্তরে তার প্রতিভার অনটন ঘটেনি কখনও। তাই উৎসবপ্রিয় বাঙালির জীবনে প্রতি বছর নতুন করে শুরু হয় তার পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণের মহোৎসব। আবার নতুন করে জীবন শুরুর অবিভাজ্য অংশকে প্র্যাগম্যাটিক হিসেবেই মনে করে। যদিও সেই পুথিপত্তর, গুরুমশাই, পণ্ডিতমশাই, শ্লেট-পেন্সিল হারিয়ে গেছে, আদর্শলিপির কদর গেছে চলে, গুরুমুখী বিদ্যা আর হাতেখড়ির যুগ বিগত। তার জায়গায় গেড়ে বসেছে ছেলেভুলানো নার্সারি আর ছেলেধরা ইস্কুলের খোঁয়াড় সদৃশ কোচিং সেন্টার। তাই শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড আবিষ্কারে অভেদ্য দেহই যথেষ্ট নয়। আমাদের সর্বস্তরে এক মারাত্মক দূষণ ক্রমশ ভয়াবহ মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত, সে উপসর্গ আর চাপা থাকছে না। চৈত্র এবং বৈশাখজুড়ে যে মহোৎসবের আসন পাতা সেখানে আমাদের দিনানুদৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রথিত করে চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, সঙ্কল্প নিরহংকার সঙ্কল্পগুলোকে গ্রথিত করে আড়ম্বরের মোহ ত্যাগ করে অন্তঃসারশূন্য বস্তুমাত্রার আমূল উচ্ছেদে জীবনের শৃঙ্খলা ও সার্থকতার কঠোর প্রতিজ্ঞায় নামতে হবে। আকাশের আলো, বিশ্বের বাতাস যেন অর্গলিত দ্বারের শিকল নেড়ে ফিরে না যায়। সেই হবে আমাদের বর্ষবরণের আবাহনের সার্থকতা। একটা নগণ্য বাহ্য আয়োজন ও সৌন্দর্যের দিকে নজর রেখে ইটের পর ইট সাজানো উন্নয়ন যথেষ্ট নয়। বাড়িতে যারা থাকবে ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্তে-মাংসে গড়া, দুঃখ-আনন্দের দাস, তারা পরিবর্তনশীল এবং বর্ধিষ্ণু। তাতে যদি নাস্তিক্যর অপবাদ আসে, অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয়। একটি আধুনিক রাষ্ট্রের উন্নয়ন যেমন প্রধান শর্ত, একটি জাতির উন্নত হওয়া তেমনি অদ্বিতীয় প্রধান স্তম্ভ। বাঙালি বাংলাদেশের আসল সত্তার প্রতিনিধি। বাংলাদেশ ও বাঙালির মর্যাদা এইখানে যে বিশ্বমানবের অনন্ত সন্ধিৎসা তার শিল্পে-সাহিত্যে-ঐতিহ্যে তার কণ্ঠে ভাষা পায়; এবং এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। অপরিণামদর্শিতায়, নানা প্রবঞ্চনায় তার দিনগত পাপক্ষয় হয়েছে; পরিচিত অভ্যস্ত জগতের তীর্থযাত্রায় কোথাও বিঘ্ন না ঘটে, অশুভবাদের পায়ে আমাদের মাথা যেন কোনও মতে নুইয়ে না পড়ে, কলুষপ্রীতির আলিঙ্গনে যেন বাধা না পড়ি– তাই হোক বর্ষবরণের অব্যর্থ মন্ত্র।

আজ ছেড়ে আসা সময়ের প্রাত্যহিক কর্মপ্রবর্তনায় লাভ-ক্ষতির আশা-আশঙ্কায় দৈনন্দিন আবেগ-উদ্বেগে, দ্বিধা-দৌর্বল্যে কেটেছে আমাদের। প্রাত্যহিক মানুষের ইতিহাসে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, আমাদের জাতীয় জীবনে ট্র্যাজেডি আছে, সর্বনাশ আছে। এই ধূলার ধরণীতে পাওয়া না-পাওয়ার সে হিসাব মেলানো কঠিন।

এসবের মধ্যে ছেড়ে এসেছি রুদ্ধশ্বাস-কেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ, সন্তানশোক, প্রিয়জন হারানোর আর্তি, বাষ্পাকুল হৃদয়ের অন্তিম পরিণতি, দগ্ধ চেহারা, খণ্ডিত দেহ, নগ্ন, নিষ্ঠুরতার জীবন্ত সব ছবি। মানুষের হুঁশ ফেরাতে আর ধর্ম ও সমাজ বাঁচাতে অলৌকিক মহিমার দ্বারস্থ হয়েই কেবল কাল কাটাব? সমাজটা কু-প্রবৃত্তি, ক্ষুব্ধ দুর্বৃত্তি, লোভ, লালসা আর দুর্মুখ দুর্বৃত্তে ভরে গেল? এত পরশ্রীকাতর, এত ঈর্ষা, এত বিতৃষ্ণ মানুষের স্বভাব? এত ধর্মগ্রন্থ, এত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পড়ে দেখে শুনে আমরা কিছুই শিখলাম না? কিছুই কী শিখব না?

ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্তম্ভ। আদর্শ গণতন্ত্রে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটলে সমাজ যমালয়ে পরিণত হয়। আজ এবং বিগত বছরগুলোর ঘটনাবলী সেই সাক্ষ্যই দেয়, যা আমাদের তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। জীবনের হাজিরাখাতা থেকে যাদের নাম কাটা গেছে, আজ বছর শেষে তারাও মনের শিকড়ে টান ধরালেন। সব শোক, বিচ্ছেদ আর হতাশার মধ্যে ধ্বনিত হোক আশার বাণী– নবপ্রভাতে জ্বলে উঠুক আলো, সকল আবরণ যাক ঘুচে। বর্ষ বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষবরণই বার বার ফিরে আসুক আমাদের কাছে। শেষহীন বিচ্ছেদ-দুঃখের তিমিরে বসেও আমরা বলব, লিখব, গাইব জীবনেরই গান। জীবন অনেক সময় বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেও মানুষের অনন্ত কৌতূহলই তাকে বাঁচিয়ে রাখে। সংবেগের সংঘাতে সমস্ত অশুভ নিপাত যাক, আত্মোপলব্ধির বাধা ঘুচিয়ে দ্ব্যর্থপ্রীতির আলিঙ্গনে বিস্তীর্ণ দেহের লতাগুল্ম ছিঁড়ে বেরিয়ে এসো হে বৈশাখ–

বৈশাখ রুদ্র, মিত্র, বলীয়ান, উদ্ভ্রান্তিক,
অস্থির, গতিস্পৃহ, ঘূর্ণি চাঞ্চল্য।
অপাপপুরুষ মাতাল মধ্যাহ্নের অনতিপরেই
নিষ্ফল কামনার দাবদাহে যেন
পূরবীর ঝড়। সন্ধ্যালগ্নে ক্ষান্তি ও মৌন।
বিনা-বাক্যে, বিমর্ষ-শূন্য মনের বৃথা উপহারে
স্বাগত তোমাকে–
এসো বৈশাখ
রাজসমারোহে এসো ॥

জামিরুল ইসলাম শরীফ
কবি, প্রাবন্ধিক

অনুবাদ গল্প

দ্বিতীয়বার বিয়ে

অমিত চৌধুরী

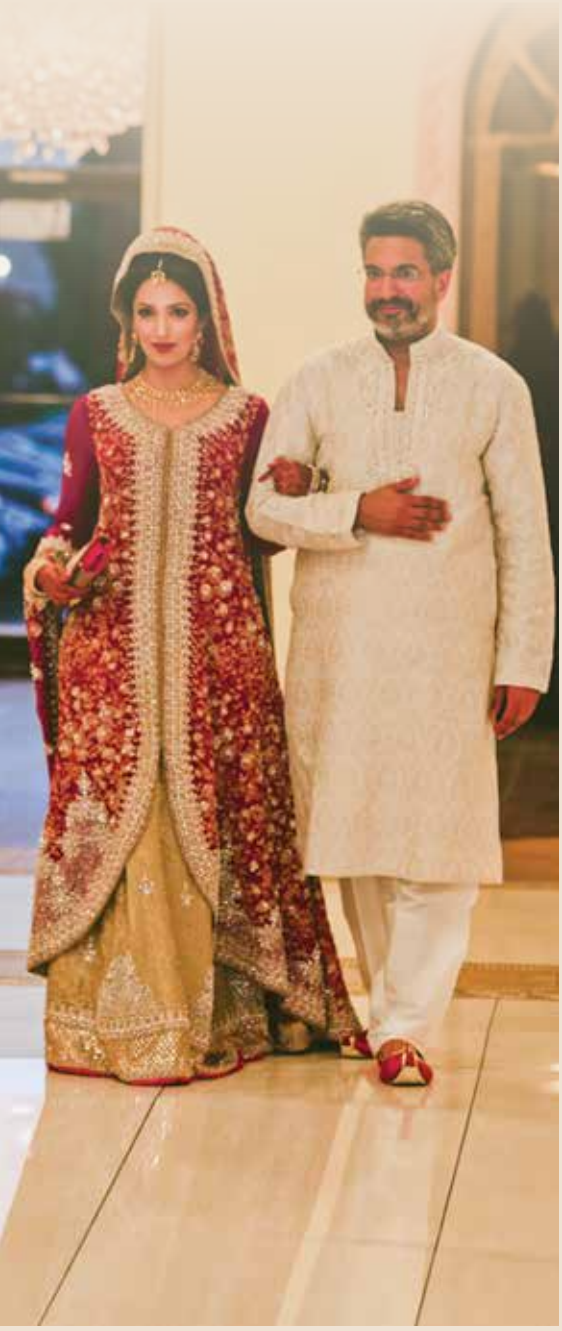

যদিও তাদের একজন কেসিংটন আর অপর জন বেসওয়াটারে বসবাস করেও এতদিন তারা একে অপরকে চিনত না। ওইদিন সন্ধ্যায় অরুণ আন্ডারগ্রাউন্ডওয়ে থেকে উপরে উঠে বৃষ্টিধোঁয়া আলোয় ঘেরা রাস্তায় এসে পৌঁছল। সে বাসায় ফিরে তার বাবা মার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলল। সে সময়ই তার বাবা মা তার বিয়ের কথা জানতে পারল। সেকেন্ড ম্যারেজ! আবার বিয়ে!

ওভারকোটটা ভেজা ভেজা মত হওয়ায় সে তা খুলে সোফার পর রাখল। একজোড়া মানব-মানবী একত্রে কয়েকবার মিলিত হওয়ার পর তারা দ্বিতীয় বিয়েতে রাজি হয়েছে। অরুণ ও অর্পিতা উভয়েই এ বিয়েতে একমত, তারা তাদের সিদ্ধান্ত ফলবতী করতে চাইল। বাস্তবে তাদের কোন ধারণা নেই উভয় পরিবারের সদস্যরা তাদের বিয়েটাকে কী চোখে দেখবে! তাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য তারা অপেক্ষায় রইল। তাদের কাছে বিষয়টা মনে হল কেনসিংটন হাই স্ট্রিট এর উপরের দু'এক ফোঁটা বৃষ্টির মত। কখন দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি নামবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে তাদের যৎসামান্যই জ্ঞান ছিল। শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্বন্ধে বাবা মাকে জিজ্ঞেস না করেই বিয়ে সম্বন্ধে তারা ভাবতে লাগল; অরুণের মনে পড়ল অনেক দিন আগের কথা। তাকে নিতে কার এসেছিল। তার চোখদুটোতে বিছানা, বিয়ের মঞ্চ, ফুলে ফুলে সাজানো গাড়ি। প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রথম বিয়ে একটা উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

অরুণ ও অর্পিতা নাইটব্রীজের কাছের একটা পুরনো পাবে মিলিত হয়ে দুটো কফির অর্ডার দিল। তাদের বিয়ের আয়োজন করতে কিন্তু প্রজাপতি কিংবা ব্রহ্মা আকাশ থেকে নেমে এলেন না। শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ের সময়ে যেমন ঝড়ঝঞ্ঝা শুরু হয়েছিল তেমনটাও হল না। সে সময় দেবতারা তাদের আলাপচারিতার মধ্যে নাক গলাতে আসেননি। দু'জন মানব-মানবী সেখানে নীরবে বসে রইল। যদি তাদের বিয়ে ভেঙে যায় তবে তার দায়ভার উভয়কেই বহন করতে হবে।

ছেলেটি মেয়েটির চাইতে লাজুক। সে যেন তার কথাবার্তায় সেটাই প্রমাণ করছিল। ছেলেটি সাহসের সঙ্গে জোরালোভাবে কথা বললেও নার্ভাস হয়ে পড়ছিল। তারা দু'জন যেন চলচ্চিত্র পরিচালকের মত কথাবার্তা বলছিল। চলচ্চিত্র পরিচালকের সঙ্গে স্ক্রিপ্ট, একটা প্লান থাকে, কিন্তু এদের কাছে কিছুই নেই। তাদের চোখ আর অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হল তারা উভয়েই ক্লান্ত। 'আপনাদের ধন্যবাদ' ওয়েট্রেস উৎফুল্লভাবে বললেও তারা কিন্তু তার কথায় কান দিল না।

তাদের মধ্যে স্থায়ী কোন বন্ধন না থাকলেও ছেলেটির উপর মেয়েটির একটা প্রচ্ছন্ন মায়া জন্মে গেছে। যদি তারা আর কখনো একে অপরের সঙ্গে মিলিত না হয় তা হলে তার প্রতি মেয়েটির মায়া মমতা কোথায় থাকবে! কিছু সময় পরে ওয়েট্রেস আবার ফিরে এসে বলল, 'আপনাদের কি আর কিছু লাগবে?'

ছেলেটি কেতাদুরস্ত ইংরেজি উচ্চারণে বলল, 'আমাদের জন্য কিছু কুকিস আনতে পার?'

ওয়েট্রেস তারকার সাইজের ফ্যাকাসে রঙের কুকিস নিয়ে এল।

ছেলে ও মেয়েটি তাদের নিমন্ত্রিতদের একটা তালিকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

'ইনি হচ্ছেন বড় জেঠু, এ সরকার'– মেয়েটি একটা কাগজের উপরের দিকে একটা নাম দেখিয়ে বলল, 'কলকাতাতে আশীর্বাদের সময় তাকে দেখতে পাবে।'

মেয়েটি তার আঙুল সেখান থেকে তুলে একটা নামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা হচ্ছে আমার একমাত্র মামা।' তার দেখানো নামের দিকে ছেলেটি তাকাল।

ছ'বছর আগে, এই মানুষগুলোই মেয়েটির প্রথম বিয়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। সে-সময় মেয়েটির বয়স ছ'বছর কম ছিল। তাদের আবারও নিমন্ত্রণ জানাতে হবে। তাদের আবার আসতে হবে ওল্ড এজ হোম, কিংবা হলিডে রিসোর্টে। আমন্ত্রিতরা তাদের ভাইঝি, নাতনি কিংবা কন্যাকে দ্বিতীয়বার আশীর্বাদ করবেন! তাদের কেউ কেউ তাদের ব্যথা-বেদনা সহ্য করে সেখানে অবস্থান করবেন।

এ সময়ে নিমন্ত্রিতদের তালিকাটি কিন্তু অনেকাংশেই সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখারই কথা। বয়োজ্যেষ্ঠদের উপদেশ না নিয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছের উপর নির্ভর করে যাদের নাম মনে আসে তারই তালিকা এটি। টেবিলের উপরে রাখা কফি কাপে ঠোঁট লাগিয়ে তারা তাদের দ্বিতীয় বিয়ের নিমন্ত্রিতদের তালিকা তৈরি করতে ব্যস্ত। তাদের একজন বলল, 'এ নামটা অবশ্যই লিখতে হবে।' আর তুমি তোমার পবিবারের বাবার দিকের কাউকেই বাদ দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত, উভয়পক্ষের নিমন্ত্রিতদের নামের তালিকা তৈরি হল। এই তালিকায় তাদের পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্তদেরই নাম অন্তর্ভুক্ত হল। এক সময় দেখা গেল কয়েকজন লোকের নাম রহস্যজনক ভাবে বাদ পড়ে গেছে, যদিও তাদের বাদ রাখার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

তারা উভয়েই বিয়ের বিষয়ে বলাবলি করল। তাদের কথাবার্তার মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠানের চাইতে বিয়ের গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে কথা ছিল বেশি। উপসংহারের চেয়ে সমসাময়িক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণই ছিল বড় কথা। বিশেষ করে অর্পিতার মনে গভীর দুঃখ নিহিত ছিল, কারণ সে এক সময় তার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও তাকে অর্পিতা ঘৃণা করত। কিন্তু সে উপলব্ধি করত বিয়ের অনুষ্ঠান জীবনের জীবন্ত প্রকাশ। দ্বিতীয়বার জন্ম কিংবা জীবনের পর আর কিছু থাকার কথা নয়। অগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হবারও কথা নয়। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া কিংবা মালাবদল ভিডিও টেপের মত

বারবার ঘটে না। যার জীবনে ছয় বছর আগে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল তার জীবনে এখন আবার তার বিয়ের অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে?

অরুণ খাবারের বিল পরিশোধ করলে অর্পিতা বাধা দিতে গেলে ছেলেটি বলল, 'বিল পরিশোধের অধিকার তো আমার আছে, তাই না?'

'সেই অধিকারটার জন্য আমাদের এই আয়োজন।' মেয়েটি জবাবে বলল।

দিন শেষ হওয়ার আগে তারা একত্রে একটা টিউবরেল ধরে হাইগেটে পৌঁছল। সেখান থেকে তারা হ্যাম্পস্টিড হিথ-এ হাজির হল।

দূর আকাশে দু'তিন খানা কালো ধরনের মেঘ, মৃদুমন্দ বাতাসে ধীরে ধীরে সেগুলো তাদের দৃষ্টি সীমার মাঝে চলে এল। তাৎক্ষণিকভাবে বৃষ্টির আশংকা আছে বলে মনে হল না। হ্যাম্পস্টিড হিথ ছিল বিপুলসংখ্যক ট্যুরিস্টে পূর্ণ। ধার্মিক লোকদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। পাতিহাঁসের স্বাভাবিক জমায়েত আর কিছু অপরিচিত পাখিদের ওড়াউড়ি তাদের চোখে পড়ল। তারা মুক্ত বাতাসে মুক্ত মনে হাঁটাহাঁটি করল। তারা বাইরের দিকে তাকাল। তারা একটা পুরনো বাড়ি দেখতে পেল। তারা সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত। অরুণের পরনে সচরাচরের মত ওভারকোট, আর অর্পিতার পরনে তার স্লাকস আর গাঢ় নীল ডুফেল কোট। তাদের পোশাক-আশাক দেখে মনে হবে তারা এখানে কোন ফ্যাংসনে এসেছে। তাদের মনে হল যে তারা এখানে ভুল দিনে এসেছে।

'খুব সুন্দর, তাই না?' বাড়িটির কাঠের দরজায় নিষ্প্রভ সূর্যের আলো জ্বল জ্বল করতে দেখে অরুণ বলল।

'খুব সুন্দর!' অর্পিতা মাথা দুলিয়ে বলল। অর্পিতা ভাবল, লম্বা বারান্দার দোতলার পুরনো বাড়িতে কার প্রথম বিয়ে হয়েছিল! অনুষ্ঠানের জন্যই এধরনের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়। বাড়িটা যেন একটা সূর্যের মত লাইট দিয়ে সাজানো। অর্পিতা ভালভাবে সেদিকে তাকিয়ে দেখল।

অর্পিতা পেছনের দিনগুলোর কথা এখন আর ভালভাবে ভাবতে পারে না। সে কি তার প্রথম বিয়েতে সুখী ছিল! শেষপর্যন্ত সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল; কারণ তার সুন্দর চেহারা, সুঠাম শারীরিক গঠনই কাল হয়ে দাঁড়ায়। আর এ জন্যই তার প্রথম বিয়েটা আগের ছেলেটার সঙ্গে হয়েছিল। অর্পিতার প্রতিভাও কম ছিল না। তার ওইসব গুণাবলীর কথাই উঠে আসে যখন কনে ও বরের একান্ত সাক্ষাৎ ঘটে। তুমি অবশ্যই অনুভব করবে একটা স্বপ্ন কিংবা নিভৃত সম্পর্ক বিয়ের মত ঘটনা ঘটায়। পরবর্তীকালে অর্পিতা আবিষ্কার করেছিল যে সে সুখী হওয়ার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত আর অনুভূতিশীল নয়, কিন্তু বাকি পৃথিবীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের একটা পন্থা আছে যাতে এক সময় সুখী হওয়া যায়, সে অবশ্যই সংযত ছিল স্বাভাবিক মানবিক সহজাত প্রবৃত্তির প্রতি।

অরুণ বিয়েতে খাবারের আয়োজনের কথা বলল। সে হয়তো বলতে চাইল এটাই অধিকতর ভাল হবে যদি তারা এ সময় বড়সড় ডিনারের আয়োজনও না করে। কিংবা কলকাতার ফাইভ স্টার হোটেলে অতিথিদেরকে শুধুমাত্র কিছু স্নাক্স ও ককটেলসের ব্যবস্থা করে তা হলেও ভাল হয়।

'চিকেন টিক্কা ও কাবাবের মতো খাবারের কথা তো তুমি জান।' অরুণ আবারও বলল।

সে বুঝাল যে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে চিকেন টিক্কা ও কাবাবের মত খাবারের আইটেম দ্বারা মিলের আয়োজন করা উচিত হবে। তারা মনে করল এর ফলে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

দু'মাস পরে, অরুণ ও অর্পিতা পৃথক পৃথকভাবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ফ্লাইটে কলকাতা এল। তারা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ছোট্ট একটা শেডের নিচে পৌঁছল। তাদের সঙ্গে একই বিমানে অনেকেই বিজিনেস ট্রিপেও এসেছে।

দমদমের কাছে অর্পিতার বাবার ফ্লাটে আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে প্রত্যেকের আগ্রহ এক ডিগ্রি কম হবারই কথা। তারা আগে একবার তাকে আশীর্বাদ করেছিল। কিন্তু এবারও ধানদূর্বা দিয়ে অর্পিতাকে আশীর্বাদ করার জন্য তখন তাদের ভাণ্ডারে অনেক অনেক আশীর্বাদ জমা ছিল।

এবার তার দ্বিতীয়বারের বিয়েতে তেমন শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান হল না, কিন্তু কয়েক বছর আগে অর্পিতার পরিবার-পরিজন কিন্তু তার বিয়েতে ধুমধাম করে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান করেছিল।

অর্পিতা এবারের বিয়ের একটা মুহূর্তে আবিষ্কার করল কয়েকটি মুখ...তারা বরের পরিবারের... তারা নতুন হলেও আগের বরের পরিবার-পরিজনের মতই।

ছোট্ট ফ্লাটটিতে একে অপরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি, পরিচিত অপরিচিত জনদের বাকবিতণ্ডা। কিছু একটা অভিজ্ঞতা আর বারবার মনে পড়ার মত কিছু পরিচিত গল্প। কয়েকটি চরিত্রকে খোঁজা। কিছু চরিত্রের পরিবর্তন অপর দিকে অন্যান্যরা এক রকমের ছিল। পরে তারা বিশ্রাম নিল যেমন অভিনেতারা অভিনয় অনুষ্ঠানের পর বিশ্রাম নিয়ে থাকে, তারা পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি অমনোযোগী ছিল।

এক সময় নীরবতা নেমে এল, অর্পিতা মনে করে সে যেন তার নতুন বাড়িতে আছে। তার মনে পড়ল শেষ বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে সবকিছু কেমন সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করে বাস্তবায়ন করার কথা। তাকে কত কষ্টের সঙ্গে তার নিজের ইচ্ছাশক্তির বলে চলতে হয়েছিল। একটা ভাড়া করা বাড়ির ছোট্ট একটা রুমে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করা হয়েছিল। অর্পিতার তার মামাতো পিসতুতো ভাইদের হাত আঁকড়ে ধরে সাবধানে পা ফেলে অগ্নি প্রদক্ষিণ করা, তার স্বামীর দিকে না তাকিয়ে তার পেছন পেছন হাঁটার ছবি মনে ভেসে উঠল। অর্পিতা ভাবল সে পুনরায় আর কখনো ওই বাড়িটিতে আসবে না, সে যেন তার হাত ও পায়ের সাহায্য ছাড়াই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে, সে যেন প্রতিবন্ধী, তবুও কিন্তু সে যে কোনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে গণ্ডির পেছনের পথ দিয়ে চলছে। অর্পিতা বলল, 'রাঙাদাদু, তোমাকে সুস্থ দেখতে পেলাম এটাই সুখের কথা! তুমি সত্যি সত্যি রাঙা!'

'রাম পান করার ফলে রাঙাদাদুর স্বাস্থ্যটা এত ভাল', কে যেন বলে উঠল।

দু'সপ্তাহ পরে, অর্পিতা ছবিগুলো দেখে বলল, 'এত ফটো! আমি বুঝতেই পারিনি কেউ এত ফটো তুলছিল। ফটোগ্রাফার কে ছিল, অরুণ?'

'আমি জানি না', অরুণ বলল। তারপর সে গর্বভরে আরো বলল, 'আমি সেখানে ছিলাম না।' প্রকৃতপক্ষেই অরুণ অর্পিতার আশীর্বাদের অনুষ্ঠানে ছিল না। আসলেই তো কনের আশীর্বাদের সময় বরের থাকার কথা নয়।

অরুণ আর অর্পিতা ফটোগুলো দেখবার জন্য পাশাপাশি বসল। তারা দু'জনেই ফটোগুলো দেখতে লাগল। তাদের চোখে মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল।

অনুবাদ **মনোজিৎকুমার দাস**

লেখক পরিচিতি

অমিত চৌধুরী প্রখ্যাত ভারতীয় ইংরেজি লেখক। জন্ম ১৯৬২ সালে কলকাতায়। তিনি ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা ছোটগল্পের মধ্যে 'রিয়েল স্টোরিস এন্ড এ রেমিনিসেন্স', 'পিকাডোর' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সেন্ট সিরিল রোড এন্ড আদার পোয়েমস' তাঁর লেখা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। লেখা উপন্যাসগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় 'এ স্ট্রেঞ্জ এন্ড সাবলাইম অ্যাড্রেস ', 'আফটারনুন রাগ', 'এ নিউ ওয়ার্ল্ড', 'দ্য ইম্মর্টালস'। তিনি লেখালেখির জন্য নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় ২০০২ সালে 'এ নিউ ওয়ার্ল্ড ' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার, ২০১২ সালে রবীন্দ্রনাথবিষয়ক প্রবন্ধের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারকে। এ ছাড়াও তিনি ১৯৯১ সালে 'এ স্ট্রেঞ্জ এন্ড সাবলাইম অ্যাড্রেস'-এর জন্য বেট্টি ট্রাস্ক পুরস্কার এবং কমনওয়েলথ রাইটার'স প্রাইজ, ১৯৯৪ সালে 'আফটারনুন রাগ' এর জন্য এনকোর এ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৯ সালে 'ফ্রিডম সঙ' গ্রন্থের জন্য লস এঞ্জেলস টাইমস বুক প্রাইজ লাভ করেন। কনটেম্পোরারি লিটারেচারের উপর 'ইনফোসিস' পুরস্কার পান। অমিত চৌধুরী শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ হিসাবেও বিশেষভাবে খ্যাত। তাঁর বেশ কয়েকটি এ্যালবাম প্রকাশিত হবার পর বহুল প্রশংসিত হয়েছে। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ ইস্ট এঙ্গলিয়ার কন্টেম্পোরারি লিটারেচারের প্রফেসর। তাছাড়া তিনি ওক্সফসন কলেজের আর্টস ফেলো, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির লেভারহালমে ফেলো, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর, ফ্রেলে ইউনিভার্সিটি, বার্লিনের স্যামুয়েল ফিসচের গেস্ট প্রফেসর। ইংরেজিতে তাঁর লেখা 'সেকেন্ড টাইম' গল্পের বঙ্গানুবাদ করা হল 'দ্বিতীয়বার বিয়ে' শিরোনামে। গল্পকার দু'জন তরুণ-তরুণীর প্রথম 'বিবাহ বিচ্ছেদ'-এর পর অন্য বর ও কনের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের বিয়ের গল্প শুনিয়েছেন।

জন্ম: ১৭ নভেম্বর ১৯১৪
মৃত্যু: ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

প্রবন্ধ

স্বতন্ত্র কমলকুমার মজুমদার

ও একটি অনন্য দ্যুতিময় সাহিত্যকর্ম

এমিলি জামান

রহস্যজারিত ধ্রুপদী আঙ্গিকের সৃষ্টি উপহার দিয়ে যাঁরা বাংলা-সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদেরই একজন অননুকরণীয় মৌলিকতায় উজ্জ্বল, নমস্য কমলকুমার মজুমদার। তাঁর বৈচিত্র্য-প্লাবিত সৃষ্টি-সম্ভারের অন্যতম মিস্টিক ও ক্ল্যাসিক নিদর্শন *অন্তর্জলী যাত্রা*।

অন্তর্জলী যাত্রা রসোত্তীর্ণ ও প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠার পেছনে এর বিষয়বস্তু (সাবজেক্ট) মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, এটা বলা যায় না। কমলকুমারের পূর্বে ও পরে 'সতীদাহ'-র অমানবিক বর্বরতা ও বিভীষিকাময় কদর্যতা একাধিক লেখকের শিল্পিত প্রতিবাদধর্মী গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়েছে। কিন্তু, তাঁরা সবাই বর্ণনার ছত্রে-ছত্রে বর্ণে-বর্ণে ছবি আঁকেননি। উপন্যাসের চাহিদা সর্বার্থে পূরণ করে সেটিকে আকর্ষক দৃশ্যকাব্যের মাত্রায় উন্নীতও করেননি। একাজটি করেছেন, ব্যতিক্রমী স্রষ্টা কমলকুমার মজুমদার। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, একাজে তিনি শতভাগ সফল হয়েছেন।

‘শান্তি’ নামের সোনার হরিণকে তাই সে কিছুতেই ধরতে পারে না। অন্তর্জলী যাত্রায় যশোবতীর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গেলে জীবনানন্দের শরণাপন্ন হতে হয়। বলতে হয়– ‘কোনো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করে/আমাদের ক্লান্ত করে/লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই।’...

অথচ, প্রতিভাঋদ্ধ পারফেকশনিস্ট কমলকুমার যে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বসৃষ্ট মণি-মাণিক্য একের পর এক ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন, সেটা কিন্তু তেমন জমকালো ছিল না। আপসহীন ও কট্টর তোষামোদ-বিরোধী কমলকুমার ‘লিটল ম্যাগ’কে তাঁর প্লাটফর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

কমলকুমার দুর্বোধ্য। সাহিত্য-গবেষকদের প্রায় প্রত্যেকেই এ বিষয়ে একমত। যেখানে শতকরা নিরানব্বই ভাগ লেখক ‘কালো বিড়াল’ লেখেন, ব্যতিক্রমী কমল সেখানে নির্দ্বিধায় ‘বিড়াল কালো’ বসিয়ে দেন। কিন্তু, এক অভিনব কৌশলে তাঁর রচনার (গল্প বা উপন্যাস) পুরোটুকুর সঙ্গে এজাতীয় শব্দবন্ধের সখ্য নির্মাণ করেন। নিরীক্ষাপিপাসু কমলকুমার বাংলা সাহিত্যে ফরাসি বাক্যরীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তিনি নিরলস চেষ্টা ও যত্নে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কমলীয় দুর্বোধ্যতা স্নায়ু-পীড়ন করে না, রসজ্ঞ পাঠকের অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে দেয়। এজাতীয় দুর্বোধ্যতা তাঁর রচনার দার্ঢ্য। তাঁর ইনটেনশনাল কমপ্লেকসিটি সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত তাঁর ছোটগল্পে। ‘মতিলাল পাদরী’, ‘আমোদ বোষ্টুমী’, ‘নিম অন্নপূর্ণা’ ইত্যাদি গল্পে তিনি বাক্যনির্মাণ ও প্রতীকী ব্যঞ্জনায় যে বর্ণাঢ্যতা সৃষ্টি করেছেন, তা সংবেদনশীল পাঠককে বারবার চমকে দেয়। তাঁর অন্যতম উপহার *গোলাপ সুন্দরী*ও যথেষ্ট ইনট্রিকেট। তবে, পারফেকশনিস্ট কমলকুমারের কলম যে যথার্থই সোনার কলম, তা তাঁর সুসংগঠিত উপন্যাস *অন্তর্জলী যাত্রা*য় শতভাগ প্রমাণিত হয়েছে। যে-বছর তাঁর *গোলাপ সুন্দরী*, *অন্তর্জলী যাত্রা* এবং আরো একটি উপন্যাস একযোগে প্রকাশিত হয়, সে-বছর আরেক শক্তিধর লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উল্লিখিত উপন্যাসগুলি খুঁটিয়ে পড়ে তাঁর এক নিবন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি গুটিকয় ভিন্নধর্মী কবিতা রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, উপন্যাসের মোড়কে ঢাকা কমলকুমারের অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ *গোলাপ সুন্দরী* ও *অন্তর্জলী যাত্রা* তাঁর সে আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। *গোলাপ সুন্দরী* ও *অন্তর্জলী যাত্রা*কে সুনীল ঐ বছরের সেরা কাব্যগ্রন্থ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সত্যিকার অর্থেই এ দুটি রচনা কবিতার চারিত্র্য বহন করছে, যা খুঁটিয়ে পড়লে অনুধাবন করা যায়।

এবারে *অন্তর্জলী যাত্রা*র অন্তর-মহলে প্রবেশ করা যাক। উপন্যাসটি একটি বিশেষ কালের সাক্ষী, যেকালে ঈশ্বরকে ডিঙিয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছিল অপব্যাখ্যা-জর্জরিত ধর্ম। সংস্কারান্ধ জনগোষ্ঠী অনুধাবন করতে অসমর্থ ছিল যে ঈশ্বর প্রতিটি প্রাণবান সত্তার ষষ্ঠ-চেতনায় নিয়ত-অস্তিত্ববান এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। স্থূল বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরের বিধানকে সনাক্ত করতে গেলে পরিণামে মর্মান্তিক শোচনীয়তা ঘনিয়ে আসে। *অন্তর্জলী যাত্রা* সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় এই সত্যই ফুটিয়ে তুলেছে।

কমলকুমার *অন্তর্জলী যাত্রা*র সলতে পাকানোর পর্বে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর এই রচনায় প্রতিফলিত হবেন তাঁর ভাববিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদ। পবিত্র গঙ্গার প্রতিও অণুবাক্যে পরোক্ষ ভক্তি নিবেদন করেছেন। কিন্তু, ভক্তির তন্ময়তা কমলের অজান্তেই রসোত্তীর্ণ শিল্পের চারিত্র্য অন্তর্ধারণ করেছে। ছড়িয়ে গেছে বিন্দু থেকে বৃত্তে। *অন্তর্জলী যাত্রা* ধুলো-মাটির পৃথিবীর গুটিকয় সাধারণ মানুষের গল্প, যে গল্পটি দৃশ্যকাব্য সংবলিত একটি শিল্পিত উপন্যাসের রূপ ধরেছে। যশোবতী, বৈজু, সীতারাম প্রমুখ আমাদের চির পরিচিত গুটিকয় চরিত্র, যারা *অন্তর্জলী যাত্রা*য় বিশেষ বেশভূষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

উপন্যাসটির সূচনাবাক্য ‘আলো ক্রমে আসিতেছে’ আর সমাপ্তি-বাক্যের শেষাংশ ‘মায়া রহিয়া গেল’। আলোয় সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু, জীবন শুধু আলো-ঝলমলে স্পষ্টতা নয়। কখনো-কখনো মায়ার অস্পষ্টতা-জড়ানো, যে অস্পষ্টতা উপন্যাসের নায়িকা যশোবতীর স্নায়ু ও মনের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল। মন ও স্নায়ুর ওপর থেকে সংস্কারের প্রগাঢ় প্রলেপ ঐ তরুণী ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারেনি। আর, পারেনি বলেই জীবন ও তারুণ্যের উদ্‌যাপনকে আচমকা বেছে নিতে গিয়েও মাঝপথে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে এবং গন্তব্য হিসেবে বেছে নিয়েছে আত্মবিসর্জন। উপন্যাসে যশোবতীই সবচেয়ে বেশি দ্বন্দ্বপীড়িত চরিত্র। অন্যতম প্রধান চরিত্র বৈজুর হিসেবটা একেবারেই সহজ-সরল। পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘণ্টাকয়েক পরেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মৃত স্বামীর সঙ্গে চিতাশয্যা ভাগ করে নেয়ার চেয়ে তার (বৈজুর) সঙ্গে যশোবতীর একাত্ম হওয়াকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করে সে। যশোবতীকে ঘিরে তার মুগ্ধতা ও ভালবাসাও মিথ্যে নয়। সে সংস্কার-নির্দেশিত ন্যায়-অন্যায়ের দোলাচলে দোদুল্যমান নয়। পক্ষান্তরে, যে দোলাচল যশোবতীকে স্বস্তি পেতে দেয়নি, তা তার নির্মাতা ভ্রান্তি-নির্দেশিত তৎকালীন সমাজ। সংকট-জর্জরিত ঐ সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ছিল অন্যতম প্রধান সংকট। গোটা সমাজের বিরুদ্ধে কোন একক-সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যুদ্ধের ফল কদাচিৎ শুভ ও শান্তিপূর্ণ হয়। অর্থাৎ, হয় না বললেই চলে। *অন্তর্জলী যাত্রা* রূপকথা নির্মাণ না করে যুক্তিনির্ভর পরিণতিতে পৌঁছেছে। দর্শনদীপ্ত সূক্ষ্মতায় জীবনশিল্পী কমলকুমার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মানুষ বড় অসহায় জীব। একমাত্র বাইরে থেকেই যে সে আক্রমণের শিকার হয়, তা নয়। মানুষকে পর্যুদস্ত করে তার অবচেতনের লাগাতার টানা-পোড়েন। ‘শান্তি’ নামের সোনার হরিণকে তাই সে কিছুতেই ধরতে পারে না। *অন্তর্জলী যাত্রা*য় যশোবতীর অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গেলে জীবনানন্দের শরণাপন্ন হতে হয়। বলতে হয়– ‘কোনো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করে/আমাদের ক্লান্ত করে/লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই।’... মৃত্যুকে মানুষ ঐ মুহূর্তেই বেছে নেয়, যখন সে সব রকমের স্নায়বিক ও মানসিক ক্লান্তির ঊর্ধ্বে উঠতে চায়। যশোবতী সেটাই করেছে। গুণী চলচ্চিত্রনির্মাতা গৌতম ঘোষ *অন্তর্জলী যাত্রা*কে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন। চলচ্চিত্রের উপাদান *অন্তর্জলী যাত্রা*র ছত্রে-ছত্রে ছড়িয়ে আছে বলেই হয়তো এটি সমাজ ও শিল্পসচেতন গৌতমের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। *অন্তর্জলী যাত্রা*য় কমল যেভাবে উপাদানসমৃদ্ধ (ডিটেইলড্) দৃশ্য এঁকেছেন, তা নিঃসন্দেহে একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের জন্য সহযোগিতাপূর্ণ। উপন্যাসের সতীদাহের দৃশ্যটির অংশবিশেষ (উল্লেখ্য যে উপন্যাসে এটি একটি সম্ভাব্য আয়োজন) উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত হল– ‘চতুর্দোলা থেকে যশোবতীকে এইবার নামানো হল। অজস্র স্ত্রী-শরীর তাঁর পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ছে। কোনো কোনো রমণী অজ্ঞান হচ্ছেন। কত শাঁখা তাঁর পায়ে লাগছে, সিঁদুর পড়ছে। স্মৃতি সংগ্রহের জন্য অনেকেই তাঁর কেশ আকর্ষণ করতে তৎপর। তিনি তাদের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে চিতায় উঠলেন। অগ্নিসংযোগ করা হল। লেলিহান শিখা। শাঁখা কড়ি স্বর্ণালঙ্কার উড়ছে। প্রলয়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। চাঁড়াল লাঠির উপর মুখ ন্যস্ত করে তাকিয়ে আছে চিতার দিকে।’

*অন্তর্জলী যাত্রা*র অন্যতম মাধুর্য এর রূপকধর্মিতা ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা। সেখানে প্রধানত এসেছে ‘রক্তিম চাঁদ’, ‘হেমলক’ আর ‘নৌকাগাত্রে আঁকা চোখ’। ঐ চোখ নদীজলের ঝাপটায় বারবার ভিজে উঠছিল। উপন্যাসের শেষাংশের ‘হেমলকে প্রতিবিম্বিত’ ঐ চোখ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায় যে, সে চোখ কি শুধুই চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নৌকাগাত্রে আঁকা চোখ, না-কি সে চোখের আড়ালে রয়েছে শোকার্ত নিরুপায় বৈজুর চোখ? এখানেই কমল রসোত্তীর্ণ যে সংবেদনশীল অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিরন্তর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফেরেন।

এমিলি জামান
সংস্কৃতিকর্মী

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ স্কিম

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের জন্য ভারত সরকার ২০০৬ সাল থেকে মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের আওতায় সরকার উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দিয়ে থাকে। স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা চার বছরের জন্য বছরে ২৪ হাজার টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা দুই বছরের জন্য বছরে ১০ হাজার টাকা করে বৃত্তি পেয়ে আসছেন। এই স্কিমে এই পর্যন্ত ১০ হাজার ৯৩৬ জন শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছেন; তাদের জন্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৬.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২০১৭ সালে এপ্রিলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর উপলক্ষে নতুন ঘোষিত স্কলারশিপ স্কিমে আগামী ৫ বছরে মোট ১০,০০০ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে এবং এ জন্য ব্যয় হবে ৩৫ কোটি টাকা। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ১,০০০ এবং স্নাতক পর্যায়ে ১,০০০– মোট ২,০০০ শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ২০ হাজার টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। চলমান পুরনো স্কলাশিপ স্কিমের পাশাপাশি এই স্কিম চলবে।

এ বছর পুরনো স্কলারশিপের আওতায় ৪০০ স্নাতক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। নতুন স্কিমে মোট সংখ্যা ১,৬২১ জন শিক্ষার্থী– এর মধ্যে ১,০০০ স্নাতক পর্যায়ের এবং ৬২১ জন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। ঢাকা বিভাগের ৩৭৬ জন শিক্ষার্থীকে সম্প্রতি বৃত্তির চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, যশোর, ময়মনসিংহের শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করা হবে।

● বিজ্ঞপ্তি

আইটেক কর্মসূচি

তরুণ পেশাজীবীদের জন্য বিশেষায়িত স্বল্প ও মধ্যম পর্যায়ের কোর্স

১৯৬৪ সালে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কৌশল কাঠামোর আওতায় ভারতের উন্নয়ন সহযোগিতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে আইটেক কর্মসূচি প্রচলিত হয় যার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ভারতের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা এবং যথাযথ প্রযুক্তির সুবিধা প্রদান করা হয়। প্রতি বছর হিসাব, নিরীক্ষা, ব্যবস্থাপনা, এসএমই, গ্রামীণ উন্নয়ন, সংসদীয় বিষয়াবলীর মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ১৬১টি সহযোগী দেশে ১০,০০০ এর বেশি প্রশিক্ষণ পর্বের আয়োজন করা হয়।

২০০৭ সাল থেকে আইটেক কর্মসূচির অধীনে ৩,৫০০ এর বেশি বাংলাদেশী তরুণ পেশাজীবী ভারতে এ ধরনের বিশেষায়িত স্বল্প ও মধ্যম পর্যায়ের কোর্স সম্পন্ন করেছে।

ভারত সরকার ১৯৭২ সাল থেকে ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদ (আইসিসিআর) এর মাধ্যমে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি দিয়ে আসছে। চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া স্নাতক থেকে পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে সকল বিষয়ে আইসিসিআর বৃত্তি দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ভারতে অধ্যয়নের জন্য ৩,২০০ এর বেশি মেধাবী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীকে আইসিসিআর শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা সকলেই বাংলাদেশ এবং দেশের বাইরে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

● বিজ্ঞপ্তি

এক নজরে অন্ধ্র প্রদেশ

দেশ	ভারত
রাজধানী	হায়দ্রাবাদ / অমরাবতী (প্রস্তাবিত)
বৃহত্তম শহর	বিশাখাপত্নম্
জেলা	১৩টি
প্রতিষ্ঠা	১ নভেম্বর ১৯৫৬
সরকার	
• শাসকবর্গ	অন্ধ্র প্রদেশ সরকার
• রাজ্যপাল	ই এস এল নরসিংহন
• মুখ্যমন্ত্রী	এন চন্দ্রবাবু নাইডু (তেলুগু দেশম পার্টি)
• বিধানসভা	দ্বিকক্ষীয় (১৭৫ + ৫৮ আসন)
• লোকসভা	২৫টি আসন
• হাই কোর্ট	হায়দ্রাবাদ হাই কোর্ট
ক্ষেত্রফল	
• মোট	১,৬২,৯৭০ বর্গকিমি (৬২,৯২০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	৮ম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৪,৯৩,৮৬,৭৯৯
• ক্রম	১০ম
• ঘনত্ব	৩০৮/বর্গকিমি (৮০০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
UN/LOCODE	AP
যানবাহন নিবন্ধন	AP
সাক্ষরতা	৬৭.৪১%
সরকারি ভাষা	তেলুগু
ওয়েবসাইট	www.ap.gov.in

ই এস এল নরসিংহন

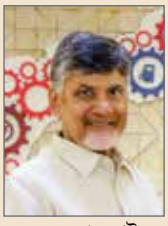
এন চন্দ্রবাবু নাইডু

রাজ্য পরিচিতি

অন্ধ্র প্রদেশ

আর ভি আর চন্দ্রশেখর রাও
সুধীর ভেঙ্কটেশ বনমালী

ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ভারতীয় রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশের দক্ষিণে তামিলনাড়ু, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিমে কর্ণাটক, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরে তেলাঙ্গানা এবং উত্তর-পুবে ওড়িশা রাজ্য অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে বঙ্গোপসাগর বরাবর ৬০০ মাইল (৯৭০ কিলোমিটার) বিস্তৃত উপকূল। তেলাঙ্গানা প্রায় গত ৬ দশক ধরে অন্ধ্র প্রদেশের মধ্যেই ছিল, তবে ২০১৪ সালে এটি অন্ধ্র প্রদেশ থেকে বেরিয়ে আলাদা একটি রাজ্যে পরিণত হয়। অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলাঙ্গানা– উভয়েরই রাজধানী হায়দ্রাবাদ। এটি পশ্চিম-মধ্য তেলাঙ্গানায় অবস্থিত।

রাজ্যের নামকরণ হয়েছে অন্ধ্র জনগণের নাম থেকে, যারা এ অঞ্চলে সুপ্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসছেন, তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, যার নাম তেলুগু। আধুনিক অন্ধ্র প্রদেশের জন্ম ১৯৫৬ সালে, যখন অন্ধ্রকে একটি আলাদা রাজ্য করার দাবি ওঠে।

বিশাখাপত্নম্ শহর থেকে বঙ্গোপসাগর

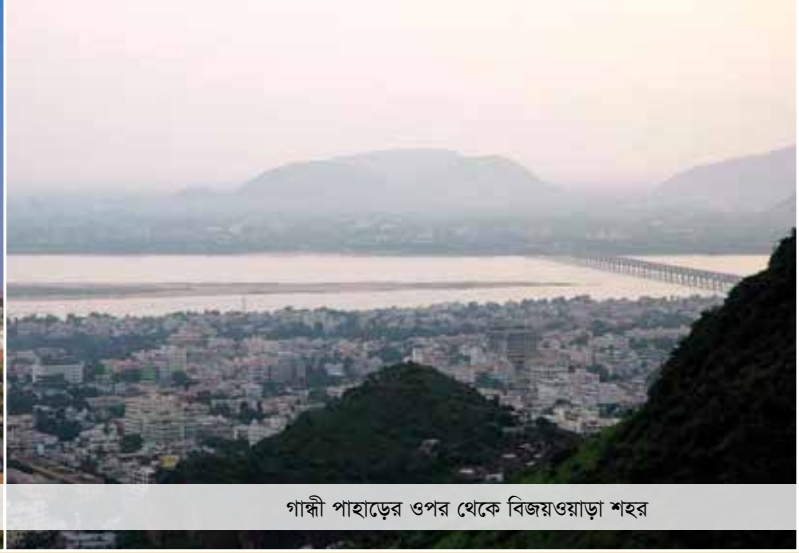

গান্ধী পাহাড়ের ওপর থেকে বিজয়ওয়াড়া শহর

যদিও রাজ্যটি প্রাথমিকভাবে কৃষিভিত্তিক, তবু এখানে কিছু খনিজ কর্মকাণ্ড চলে এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্পকারখানা রয়েছে। রাজ্যের ক্ষেত্রফল ১ লাখ ৬ হাজার ২শো ৪ বর্গমাইল (২ লাখ ৭৫ হাজার ৬৮ বর্গকিমি)। জনসংখ্যা ৮ কোটি ৪৬ লাখ ৬৫ হাজার ৫শো ৩৩।

ভূমিরূপ

রাজ্যের ৩ প্রধান ভৌত ভৌগোলিক অঞ্চল রয়েছে– বঙ্গোপসাগর থেকে পাহাড় পর্যন্ত পুবের উপকূলীয় সমভূমি; পূর্ব ঘাট পর্বতমালা, যা উপকূলীয় সমভূমির পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্শ্বদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘাটের পশ্চিমের মালভূমি। অন্ধ্র অঞ্চল নামে পরিচিত উপকূলীয় সমভূমি রাজ্যের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত অনেকগুলি নদী দ্বারা বিধৌত, যার সবই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে। এসব নদীর মধ্যে প্রধান গোদাবরী ও কৃষ্ণার বদ্বীপ নিয়ে সমভূমির মধ্যাঞ্চল গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের পলিমাটি অতিশয় উর্বর।

মধ্যভারত থেকে সুদূর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি বৃহত্তর পর্বতমালার সমন্বয়ে গঠিত পূর্ব ঘাট পূর্ব-উপকূলের প্রায় সমান্তরাল। বড় বড় কয়েকটি নদী-উপত্যকায় বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পর্বতমালা ধারাবাহিক হতে পারেনি। এই পর্বতমালার পার্শ্বদেশের মাটি খুবই সচ্ছিদ্র– জলধারণে অক্ষম।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের মালভূমি অঞ্চল কঠিন শিলায় গঠিত। এটি দাক্ষিণাত্যের অংশ এবং সাধারণভাবে রায়ালাসীমা নামে পরিচিত। এটি দূর দক্ষিণ-পশ্চিমের সুউচ্চ এলাকা যার উচ্চতা ২ হাজার ফুটের অধিক। এটি ক্রমশ উত্তর-পুবে ঢালু হয়ে গেছে। পেন্নেরু নদী প্রধান জলনিকাশি ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। ক্ষয়ের ফলে উপত্যকাসমন্বিত মালভূমি এলাকায় লাল বেলেমাটি ও বিচ্ছিন্ন পর্বত দেখা যায়। এ এলাকার কোথাও কোথাও কালো মাটি দেখা যায়।

জলবায়ু

মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্ম স্থায়ী হয়। তারপর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৌসুমি বর্ষাকাল এবং অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল স্থায়ী হয়। সব মিলিয়ে অন্ধ্র প্রদেশে প্রধানত ৩ ঋতু। গ্রীষ্ম প্রচণ্ড গরম এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ, দৈনিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯৫° ফারেনহাইট (৩৫° সেলসিয়াস); এমনকি মধ্যাঞ্চলে তাপমাত্রা ১০৪° ফারেনহাইট (৪০° সেলসিয়াস) ছাড়িয়ে যায়। দূর দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্রীষ্মের রাতে তাপমাত্রা নেমে ৭০° ফারেনহাইট (২০° সেলসিয়াস)-এ এসে দাঁড়ায়। শীতকাল মোটামুটি ঠাণ্ডা, জানুয়ারিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৮৬° থেকে ৯৫° ফারেনহাইট (৩০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস)-এর মধ্যে ওঠানামা করে। অবশ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এমন তাপমাত্রা থাকে না। রাজ্যের সর্বোচ্চ উত্তর-পুব অংশে তাপমাত্রা শীতকালে ৬০° ফারেনহাইট (১৫° সেলসিয়াস)-এর নিচে নেমে যায়।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মালভূমি এলাকার দিকে কমতে থাকে। উপকূলীয় এলাকায় বছরে ৪০ থেকে ৪৭ ইঞ্চি (১ হাজার থেকে ১২শো মিমি) বৃষ্টিপাত হয়, অন্যদিকে মালভূমির সর্বপশ্চিমে এর মাত্র অর্ধেক বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাত ৪৭ ইঞ্চি ছাড়িয়ে যায় এবং কখনও তা ৫৫ ইঞ্চিতে পৌঁছয় (১৪শো মিমি)।

উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল

অন্ধ্র প্রদেশের উপকূলীয় সমভূমিতে ম্যানগ্রোভ জলাভূমি এবং তালগাছ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, তবে মালভূমির ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পর্বতমালায় কাঁটা জাতীয় গাছ বিদ্যমান। রাজ্যের মোট এলাকার এক-পঞ্চমাংশ বনভূমি। পূর্বঘাট প্রধানত ঘনবনে আচ্ছাদিত। এসব বনে বাষ্পীয় পত্রমোচী এবং উষ্ণমণ্ডলীয় বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে কৃচিৎ গাছপালা দেখা যায়; সেগুন, রোজউড, বুনো ফলের গাছ এবং বাঁশ প্রচুর জন্মে। রাজ্যের অন্যত্র নিম (যা থেকে সুগন্ধী তেল উৎপন্ন হয়), বট, আম এবং পিপুল গাছ সুপ্রচুর। অন্ধ্র প্রদেশে ফুলগাছও প্রচুর জন্মে– বেলি, গোলাপ এবং অসংখ্য স্থানীয় প্রজাতির ফুলগাছ দেখা যায়। বিশেষ করে পূর্বঘাটের পার্বত্য অঞ্চলে এসব ফুল বেশি দেখা যায়।

সাধারণ গৃহপালিত জন্তু (কুকুর, বিড়াল ও ছাগল) ছাড়াও রাজ্যের পাহাড় ও বনে বাঘ, কালো হরিণ, হায়েনা, ভল্লুক, গাউর, ও চিতল দেখা যায়। ফ্লেমিংগো, পেলিক্যান এবং কয়েকটি বিরল প্রজাতির পাখি যেমন জার্ডন কার্সারের মত হরেক প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। এগুলি পূর্বঘাটের কাঁটা গাছ আচ্ছাদিত বনাঞ্চলে বাস করে। পূর্বাঞ্চলীয় উপকূল সামুদ্রিক কচ্ছপের আবাসভূমি।

জনগণ

অন্ধ্র প্রদেশের জনসংখ্যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই খুবই

স্বর্ণমুখী নদীর তীরে শ্রীকালোহস্তি মন্দির

নেল্লোর শহরের আবাসিক এলাকা

চন্দ্রগিরি দুর্গের রাজমহল

বৈচিত্র্যময়। সাধারণভাবে রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক শ্রেণি বা বর্ণের দ্বারা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত এবং বিশেষ নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ভিত্তিক। তেলুগু রাজ্যের সরকারি এবং সর্বাধিক কথিত ভাষা। একটি ছোট সংখ্যালঘু অংশের ভাষা উর্দু, যা প্রধানত উত্তর ভারত ও পাকিস্তানের ভাষা। বাকিরা সীমান্তবর্তী বিভিন্ন ভাষা যেমন হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মারাঠি ও উড়িয়ায় কথা বলে। লাম্বাডি (বানজারি) ও একাধিক অন্য ভাষায় কথা বলে রাজ্যের তফসিলী আদিবাসীরা। তফসিলী আদিবাসী ও তফসিলী সম্প্রদায়ের (অচ্ছুত) মানুষের সংখ্যা অন্ধ্র প্রদেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশের বেশি।

অন্ধ্র প্রদেশের বাসিন্দাদের এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু। ক্ষুদ্রতর অংশ ইসলাম বা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। খ্রিস্টানরা প্রধানত শহর ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাস করে। অন্যদিকে মুসলমানরা রায়ালাসীমা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

বসতির ধরন

জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শহর এলাকায় বসবাস করে। শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে অর্ধেক আবার ১০টি সবচেয়ে জনবহুল শহরে বাস করে যেগুলি প্রধানত শিল্প ও উৎপাদন নগরী হিসেবে পরিচিত। উত্তর-পুবের এমন দু'টি শহর হচ্ছে বিশাখাপত্নম্ ও বিজয়ওয়াড়া। অন্ধ্র প্রদেশের অন্যান্য বড় শহরের মধ্যে আছে গুন্টুর, কুরনুল ও রাজামুন্দ্রি।

অর্থনীতি

কৃষি, বন ও মৎস্য আহরণ

খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী কৃষিখাতই রাজ্যের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। অন্ধ্র প্রদেশ দেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ধান উৎপাদনকারী রাজ্যও বটে। রাজ্যের প্রধান তিন নদী গোদাবরী, কৃষ্ণা ও পেন্নেরু কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তিরুমলের ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ

দীর্ঘদিন ধরে নদীর উপকারিতা ভোগ করছিল অন্ধ্র অঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসমূহ– তারা ব্যাপক সেচ সুবিধা পাচ্ছিল। তবে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেন্নেরু ও অন্যান্য নদীতে বাঁধ ও জল সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে এখন উপকূলীয় ও শুষ্কতর উজান এলাকা সেচ সুবিধা ভোগ করছে। খাল কেটে জল নিয়ে রায়ালাসীমা মালভূমি অঞ্চল শস্যশ্যামল হয়ে উঠছে এবং এসব অঞ্চলে নানা কৃষিভিত্তিক শিল্প কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে। কৃষ্ণার জলসেচে নাগার্জুন সাগর বহুমুখী প্রকল্পে ধান ও আখের উৎপাদন ব্যাপক বেড়েছে। স্থানীয় ধান থেকে চালের ময়দা, তুষের তেল, রং ও বার্নিশ, সাবান ও সাবান-গুঁড়ো, কার্ডবোর্ড ও অন্যান্য প্যাকেজিং দ্রব্য, পশুখাদ্য উৎপন্ন হয়। অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য যেমন খাদ্যদানা, ডাল (সীম বিচি ও বিভিন্ন ডালের দানা), কাজু বাদাম, ভুট্টা ও তুলা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত হয় এবং স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ফল ও সবজি প্রক্রিয়া ও বাজারজাত করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অন্ধ্র প্রদেশে পশুপালন লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে। শস্য উৎপাদনে যে পরিমাণ অর্থ আসে, তার প্রায় অর্ধেক আসে পশুসম্পদ থেকে। গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, শুকর ও পোল্ট্রিসহ পশুসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুধ ও ডিম উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশের বনাঞ্চলে সেগুন ও ইউক্যালিপ্টাসের মত উচ্চমানের গাছ জন্মে, যা থেকে বছরে ডাল কাঠ পাওয়া যায়। কাঠ ছাড়াও শাল বীজ (যা থেকে ভোজ্য তেল পাওয়া যায়), টেণ্ডুপাতা (বিড়ি তৈরির পাতা), কায়ারা আঠা ও বাঁশ পাওয়া যায়– তার গুরুত্বও কম নয়।

দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত ও প্রভূত নদীনালার কারণে রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ এবং মৎস্য শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটেছে। মিষ্টি জলের মাছ, আধা মিষ্টি-আধা লোনাজলের (অর্থাৎ ব্রাকিশ ওয়াটার) মাছ এবং সামুদ্রিক লবণজলের মাছ এ রাজ্যের মৎস্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। গলদা, বাগদা মৎস্য শিল্পে অন্যতম প্রধান উপাদান।

সম্পদ ও শক্তি

রাজ্যের প্রধান খনিজ সম্পদের মধ্যে অ্যাসবেস্টস, মাইকা, ম্যাঙ্গানিজ, ব্যারাইট ও উচ্চমানের কয়লা প্রধান। রাজ্যের দক্ষিণাংশে নিম্নমানের লৌহ আকরিক পাওয়া গেছে। দেশের ব্যারাইটের একটা বড় অংশ অন্ধ্র প্রদেশে উৎপাদিত হয়। এটি দক্ষিণ ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে উল্লেখযোগ্য কয়লা মজুদ আছে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বিভিন্ন বেসিনে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলেছে। গোলকোণ্ডার হীরের খনি জগদ্বিখ্যাত যা থেকে কোহিনূর ও অন্যান্য বিখ্যাত পাথর উৎপন্ন হয়েছিল। কোয়ার্টজ, চুনাপাথর ও গ্রাফাইটও পাওয়া যায়। রাজ্য একটি মাইনিং ও মেটাল ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছে যা খনিজ সম্পদ আহরণে কাজ করে যাচ্ছে।

অন্ধ্র প্রদেশের বিদ্যুতের অধিকাংশই উৎপাদিত হয় সরকারি

বিশাখাপত্নমের আনকাপাল্লের কাছে বোজ্জান্নাকুণ্ডায় পাথর-খোদাই বুদ্ধ

গুন্টুরের শ্রী শ্রীনগেরি মঠ

খাতের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। শ্রীশৈলমে তেলাঙ্গানা সীমানা বরাবর কৃষ্ণা নদীতে এবং নাগার্জুন সাগরে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে, যা রাজ্যের বিদ্যুতের দ্বিতীয় উৎস। অধিকন্তু সরকার অনেক উইন্ডমিল স্থাপন করেছে। একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকে। তারাও বায়ুবিদ্যুৎ, জৈববিদ্যুৎ ও অন্যান্য অপ্রচলিত উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

উৎপাদন

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে অন্ধ্র প্রদেশ অন্যতম শিল্পোন্নত রাজ্যে পরিণত হয়। খনিজ, তৈজস ও নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন শিল্প কৃষির পরই অর্থনৈতিক শক্তিধর খাত। বিশাখাপত্নম্ এলাকায় জাহাজ নির্মাণ, এয়ারোনটিকস্, ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম, মেশিন যন্ত্রাংশ ও ওষুধের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পূর্ব-মধ্যাঞ্চলের বিজয়ওয়াড়া ও গুন্টুরে অনেক বেসরকারি শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে যেখানে রাসায়নিক, বয়ন, সিমেন্ট, সার, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ও সিগারেট উৎপন্ন হয়। কাঁচামালের প্রাপ্যতা ও বন্দর সুবিধার কারণে বিশাখাপত্নমে একটি বিরাট ইস্পাত প্রকল্প গড়ে উঠেছে। এখানে একটি তেল শোধনাগারও আছে, আছে একটি জাহাজ নির্মাণ ইয়ার্ড। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে জল ও তাপ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাজ্যের শিল্পায়ন ও সেচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সেবাসমূহ

অন্ধ্র প্রদেশের অর্থনীতির বৃহত্তম অংশ হচ্ছে সেবাখাতসমূহ। ব্যাংকিং ও বিমা, যোগাযোগ ও জনপ্রশাসন তিন প্রধান খাত। অন্যান্য সেবার মধ্যে আছে পর্যটন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড; হিন্দু ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক স্থাপনা, প্রাকৃতিক অঞ্চল, পাহাড়-পর্বত এবং প্রাণবন্ত নগরাদি– যা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করছে।

যাতায়াত

রাজ্যে বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর রয়েছে– এর মধ্যে বিজয়ওয়াড়া, তিরুপতি ও বিশাখাপত্নম্ বিখ্যাত। ব্যাপকভিত্তিক সড়ক ও রেল সংযোগ অন্ধ্র প্রদেশকে সারা ভারতের সঙ্গে সুসংযুক্ত করেছে। বিভিন্ন শহরের মধ্যে আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস বিদ্যমান। উপকূলীয় এলাকাবর্তী নদীপথ, বিশেষ করে লবণাক্ত জলের কোম্মামুর (বাকিংহাম) ক্যানেল যা চেন্নাইয়ের দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে উপকূলের সমান্তরাল প্রবাহিত, কার্গো পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। বিশাখাপত্নম্ একটি প্রধান আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর।

সরকার ও সমাজ

সাংবিধানিক কাঠামো

অন্ধ্র প্রদেশ ভারত প্রজাতন্ত্রের একটি সাংবিধানিক ইউনিট এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই এর সরকার কাঠামো ১৯৫০ সালের জাতীয় সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির মনোনীত গভর্নর রাজ্য প্রশাসনের সাংবিধানিক প্রধান। তবে রাজ্য পরিচালনায় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত। এককক্ষবিশিষ্ট বিধানসভার সদস্যরা আঞ্চলিক আসনে পাঁচ বছরের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হন।

রাজ্যের সচিবালয় হায়দ্রবাদে অবস্থিত। হাই কোর্টও এখানে অবস্থিত। অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলাঙ্গানা এ উচ্চ আদালতের আওতাভুক্ত। হাই কোর্টের নিজেরই কোন কোন বিষয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ক্ষমতা রয়েছে। বিশাখাপত্নমে ভারতীয় নৌবাহিনির পূর্বাঞ্চলীয় নৌ কমান্ডের সদর দফতর অবস্থিত।

স্বাস্থ্য ও কল্যাণ

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকারি সহায়তায় স্বাস্থ্য সুবিধা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্মসূচির আওতায় নিরাময় ও প্রতিরোধযোগ্য স্বাস্থ্য সহায়তা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

বিশাখাপত্নমের কিং জর্জ হাসপাতালের মত শহুরে চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ছে; চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকারের একটি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিও রয়েছে। স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সরকারি কর্মচারীদের আয়ের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমা রয়েছে। পঙ্গু, তফসিলী সম্প্রদায় ও তফসিলী আদিবাসী এবং সামাজিক কাঠামোয় সমন্বিত নয় এমন জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কর্মসূচি রয়েছে।

শিক্ষা

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশুনোর আগে রাজ্যে ১০ বছরের স্কুল ও ২ বছরের কলেজ শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ১৯৬১ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশে অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়

খাম্মাম জেলায় গোদাবরী নদীর উপর ডোম্মুগোডেম বাঁধ

শ্রীশৈলমে কৃষ্ণা নদী

বিশাখাপতনমের কাম্বালাকুণ্ডা বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য

রয়েছে যেখানে স্নাতকোত্তর ও গবেষণা কার্যক্রম চলে। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান খুবই সন্তোষজনক। আছে প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

সাংস্কৃতিক জীবন

ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অন্ধ্রের অবদান বিরাট। সুপ্রাচীনকাল থেকে এখানে স্থাপত্য ও চিত্রকলা খুবই সমৃদ্ধ। 'কুচিপড়ি' নাচ ভারতীয় ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শন। অন্যদিকে কর্ণাটকী সংগীতের মূল অন্ধ্রে প্রোথিত। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের বড় বড় শিল্পীদের অনেকে দক্ষিণ ভারতীয় এবং তেলুগু ভাষায় অনেক গান রচিত হয়। দ্রাবিড়ী-পরিবারের ৪টি সাহিত্যভাষার অন্যতম তেলুগু ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্য নবজাগরণে তেলুগু সাহিত্য ছিল উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্র প্রদেশ থেকে ইংরেজি, তেলুগু ও উর্দু ভাষায় বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশিত হয়। তেলাঙ্গানা অঞ্চলের মুসলিম সংস্কৃতি রাজ্যের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।

ভারতের স্বাধীনতার আগে শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন প্রধানত রাজপরিবার ও বেসরকারি সংস্থা। স্বাধীনতার পর স্বায়ত্তশাসিত সাহিত্য ও শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা চারুকলা, নাচ, নাটক, সংগীত ও সাহিত্য চর্চা ও প্রসারে প্রভূত অবদান রাখছে। গ্রামের তুলনায় শহরে সচেতন সাংস্কৃতিক চর্চা বেশি– সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্যিক আড্ডা এবং ধর্মীয় আলোচনা ও সমাবেশের অধিকাংশই শহরকেন্দ্রিক। নানা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা-ঐতিহ্য অনুসারী ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়েছে, যা গ্রামীণ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যই প্রকাশ করে। গীতিকাব্য, পুতুল নাচ ও গল্প বলা দেশজ গ্রামীণ সংস্কৃতির অংশ। এসবের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগ বিদ্যমান। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশন ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেটের বিস্তার অন্ধ্রের চিরায়ত ঐতিহ্য গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কাছে এবং শহুরে সম্প্রদায়ের কাছে গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচিতি বাড়ছে।

গোদাবরী নদীর ওপর নতুন ও পুরনো সেতু

ইতিহাস

মধ্য ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে 'অন্ধ্র' মানুষজনের বসবাসের কথা খ্রিস্টপূর্ব হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখ থাকলেও অন্ধ্রের সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় মৌর্য রাজবংশের সময়কাল থেকে। মৌর্যদের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী। মহান মৌর্য সম্রাট অশোক (শাসনকাল ২৬৫-২৩৮ খ্রি.পূ.) দক্ষিণের অন্ধ্র অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য বৌদ্ধ মিশন প্রেরণ করেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে অন্ধ্র রাজবংশের অন্যতম খ্যাতিমান শতবাহনরা (বা শতকর্মী) ক্ষমতায় আসেন। শতবাহনরা গোটা দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের সঙ্গে রোমের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। তাঁরা বিভিন্ন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এঁদের শাসনামলে নানা স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে ওঠে। তাঁদের প্রধান নগর অমরাবতীতে অনেক বৌদ্ধ স্মারক নির্মিত হয়, যা স্থাপত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করে। দাক্ষিণাত্যের (এখন মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত) অজন্তা গুহার বিখ্যাত চিত্রকলা অন্ধ্র চিত্রকরদের উৎকর্ষের পরিচায়ক। অন্ধ্রদের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তাঁদের রাজধানীতে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যেখানে নাগার্জুন (১৫০-২৫০ খ্রি.) বৌদ্ধধর্মের মহাযান ধারার প্রবর্তন করেন। নাগার্জুনকোণ্ডায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই সময়ের গৌরবগাথা মনে করিয়ে দেয়।

অন্ধ্রদের সমৃদ্ধি পরবর্তী সহস্রাব্দেও অব্যাহত থাকে। একাদশ শতাব্দীতে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজবংশ অন্ধ্র এলাকাসমূহকে একত্রিত করেন। চালুক্যদের আমলে হিন্দু ধর্মের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। আদি তেলুগু কবি নান্নায়া সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতের তেলুগু অনুবাদ শুরু করেন। সেখান থেকেই সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে তেলুগুর জন্ম। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ওরাঙ্গলের কাকাতিয়া (বর্তমানে তেলাঙ্গানার অন্তর্ভুক্ত) রাজবংশ সাংস্কৃতিক ও সামরিকভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তাঁদের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্যসম্পর্ক শিখরস্পর্শ করে।

এ সময় উত্তর-ভারতে ইসলামের অনুসারীরা শাসন ক্ষমতা দখল করে এবং দক্ষিণে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে ওরাঙ্গলের পতন ঘটে। তবে ওরাঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজয়নগর রাজ্যের পত্তনে মুসলিম শক্তির প্রসার খর্ব হয়। শুধু অন্ধ্রের ইতিহাস নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বিজয়নগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণদেব রায় (শাসনকাল ১৫০৯-২৯ খ্রিস্টাব্দ) সামরিক গৌরব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সুশাসন এবং শৈল্পিক উৎকর্ষের সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন। এ সময় তেলুগু সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। চারপাশের মুসলিম শাসকজোটের সাঁড়াশি আক্রমণে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগরের পতন ঘটে। তারপর গোটা অন্ধ্র এলাকা মুসলমানদের করতলগত হয়।

রায়ালাসীমা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

হায়দ্রাবাদের নিজামরা প্রতিপক্ষদের আক্রমণ থেকে তাদের রাজ্য রক্ষায় প্রথমে ফরাসি, পরে ব্রিটিশ সমর্থন প্রার্থনা করায় সপ্তদশ শতব্দীতে ভারতীয় রাজনীতিতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। সাহায্যদানের পরিবর্তে ব্রিটিশরা নিজামদের কাছ থেকে মাদ্রাজ শহরের উত্তরাংশের উপকূলীয় জেলাসমূহ এবং সন্নিহিত এলাকা লাভ করে। এভাবে অন্ধ্র দেশের অধিকাংশ এলাকা ব্রিটিশ শাসনাধীন হয় এবং তারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কায়েম করে। তেলুগুভাষী তেলাঙ্গানা অঞ্চলে হায়দ্রাবাদের নিজামদের শাসন অব্যাহত থাকে। তবে ফরাসিরা কয়েকটি শহর দখল করে নেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে অন্ধ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক হয়ে ওঠে। কান্দুকুরি বীরেশলিঙ্গমের মত নেতা হয়ে ওঠেন সমাজ সংস্কারের নায়ক। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অন্ধ্র নেতাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এলাকাটি শাসন ও ভাষাগতভাবে বিভক্তই থেকে যায়। ১৯৫০ সালে অন্ধ্রের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলকে মাদ্রাজ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তেলাঙ্গানা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫২ সালে স্বতন্ত্ররাজ্যের দাবিতে স্থানীয় নেতা পতি শ্রীরামুলু অনশনে মৃত্যুবরণ করলে অন্ধ্রের দাবি বিশেষ নাটকীয়তা অর্জন করে। ১৯৫৩ সালের ১ অক্টোবর সরকার জনগণের দাবি মেনে পৃথক অন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার সঙ্গে দক্ষিণের সাবেক মাদ্রাজ রাজ্যের তেলুগুভাষী জেলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে ভারতজুড়ে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পথ প্রসারিত হয়। ১৯৫৬ সালের 'রাজ্য পুনর্গঠন আইন' অনুযায়ী হায়দ্রাবাদ ভেঙে তেলুগুভাষী জেলাগুলো অন্ধ্ররাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এভাবে ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর নতুন রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশের জন্ম হয়।

নতুন রাজ্য সরকার তেলাঙ্গানা ও রায়ালাসীমায় দুটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করেন। এ দু'টি অঞ্চল উপকূলীয় অন্ধ্র এলাকার তুলনায় অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল। ফলে ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে স্বতন্ত্র তেলাঙ্গানা রাজ্যের দাবি ওঠে।

১৯৬৯ সালের শেষভাগে সরকার স্বতন্ত্র রাজ্যের সমর্থকদের দাবি কঠোর হস্তে দমন করে। তবু আন্দোলন থামানো যায়নি। একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ২০০১ সালে 'তেলাঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হলে অন্ধ্র প্রদেশ থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র তেলাঙ্গানা রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি নতুন মাত্রা পায়। তেলাঙ্গানা রাজ্যের দাবিদাররা হায়দ্রাবাদকে তাদের রাজ্যের রাজধানী করতে চাইছিলেন, যা অন্ধ্র প্রদেশ সরকারের স্বার্থপরিপন্থী। যা হোক, শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১০ বছর হায়দ্রাবাদ অন্ধ্র ও তেলাঙ্গানার রাজধানী হিসেবে থাকবে। তারপর এটি শুধু তেলাঙ্গানার রাজধানী হবে। সেই মত ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সংসদের উভয়কক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনক্রমে ২ জুন স্বতন্ত্র তেলাঙ্গানা রাজ্যের সৃষ্টি করে।

১৯৫৩ সালে অন্ধ্র রাজ্য গঠনের পর পরবর্তী তিন বছরে অন্ধ্র প্রদেশে রূপান্তর থেকে দীর্ঘকাল রাজ্যটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শাসনাধীন ছিল। ১৯৮০-র দশকের প্রথম দিকে তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র সৃষ্টি হয়। দলটি অন্ধ্র প্রদেশ থেকে তেলাঙ্গানার বিচ্ছিন্নতার দাবি না তুললেও রাজ্যের ওপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে ক্ষমতায় আসে। নেতৃত্ব দেন দলের প্রতিষ্ঠাতা নন্দমুরি তারকা রামা রাও। তাঁর মৃত্যুর পর ২০০৪ পুনরায় কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত নরচন্দ্রবাবু নাইডু দলের নেতৃত্ব দেন। ২০১৪ সালে চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বে টিডিপি আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

আর ভি আর চন্দ্রশেখর রাও
সুধীর ভেঙ্কটেশ বনমালী
অন্ধ্র প্রদেশের প্রাবন্ধিক ও লেখক

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

কাবাডি

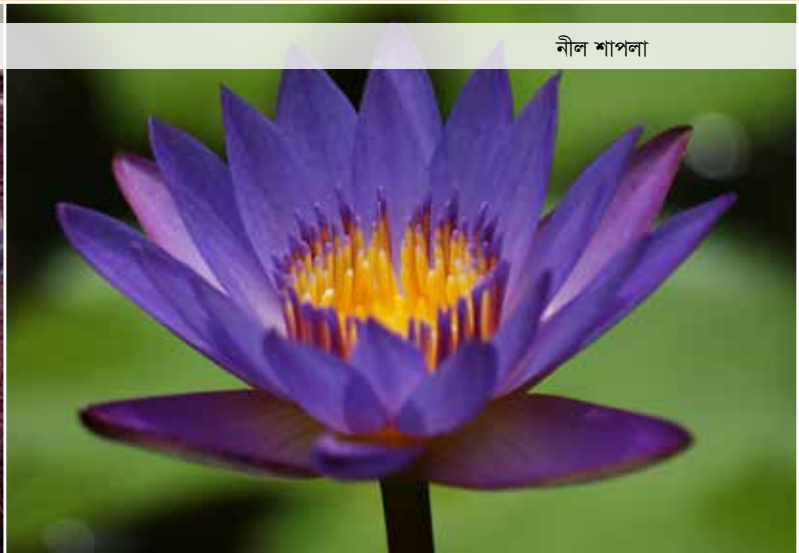

নীল শাপলা

অন্ধ্র প্রদেশের রান্না

অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যটি এর মসলাদার খাবারের জন্য বিখ্যাত। রাজ্যের প্রত্যেকটি অঞ্চলের রান্না আলাদা আলাদা। রান্নার অধিকাংশ থালিই গরম ও সুগন্ধি মসলাযুক্ত। দাক্ষিণাত্যের অনেক খাবারই এসেছে পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে। খাদ্য তালিকায় প্রধানত ভাত, সবজি, মাছ ও মাংস থাকে। নিজামরা অন্ধ্রের খাদ্যাভাসে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। কড়া মসলাদার খাবার ছাড়াও এখানে মিষ্টি জাতীয় বিশ্ববিখ্যাত খাবারও রয়েছে।

অন্ধ্র প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় রান্না

উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ: উর্বর ব-দ্বীপ অঞ্চলটির মাঠে মাঠে প্রচুর ধান জন্মে। ভাত এখানকার প্রধান খাদ্য– সঙ্গে হরেকরকমের সবজি। অঞ্চলটিতে যেহেতু প্রচুর মরিচ ও অন্যান্য মসলা জন্মে– সেজন্যে এখানকার খাবার ঝালযুক্ত ও মসলাদার।

হর্স গ্রাম দিয়ে তৈরি উলাভা চরু বিখ্যাত পানীয়। মাছের স্টুও খাদ্য তালিকার শীর্ষে থাকে। যেহেতু এটি বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী, সেজন্য এখানে সামুদ্রিক খাবারও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভাত, সিরিয়াল ও সামুদ্রিক খাবার এতদঞ্চলের থালিতে অনিবার্য।

উত্তর-পূর্ব অন্ধ্র: বিশাখাপত্নম্, বিজয়নগরম্, শ্রীকাকুলম্ এবং ওড়িশা ও বঙ্গোপসাগরের সীমান্তবর্তী অন্যান্য অঞ্চল একত্রে উত্তর অন্ধ্র অঞ্চল নামে পরিচিত। এখানকার খাবার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মিষ্টি জাতীয়। সব সবজিতে মেথি ও সরিষা বাটা থাকে। অনেক সবজিতে পেঁয়াজ বাটাও থাকে। উৎসবের সময় ভাতের সঙ্গে এসব সবজি পরিবেশন করা হয়।

হিং ও তেঁতুল দিয়ে টক-মিষ্টি খাবার বানানো এ অঞ্চলের বিশেষত্ব। পাটালি গুড়, ভাত ও ভুট্টা দিয়ে বানানো স্টু আরেকটি সুস্বাদু পদ। অন্ধ্রের চাটনির স্বাদ নিতে ভুলবেন না। মরিচ থেকে শাক– সব কিছুরই এরা টক রান্না করতে পারে; সবকিছু দিয়েই তাদের আচার। মরিচ, আম, শাকের চাটনি বিখ্যাত।

দক্ষিণাঞ্চলীয় অন্ধ্র: অন্ধ্রের দক্ষিণাঞ্চলকে বলা হয় রায়ালাসীমা। যেহেতু এটি তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের নিকটবর্তী, তাই এখানকার রান্নার সঙ্গে এ দুটি রাজ্যের রান্নার সাযুজ্য আছে। এরা সবকিছুতেই ঘি ব্যবহার করে। রাগি সংগতি দিয়ে শাক রান্না এ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ থালি। পাটালি গুড় দিয়ে চালের ভারতীয় ডোনাট এ অঞ্চলের রসনাতৃপ্তিকর খাবার। বাদাম, পাটালি গুড় ও চাল দিয়ে পাকানো পাকম্ উনডালু আপনি চেখে দেখতে পারেন।

তেলাঙ্গানা: তেলাঙ্গানার প্রধান খাদ্য রুটি। প্রচুর টক দিয়ে তরকারির সঙ্গে খুদ মিশিয়ে একটি পদ রান্না করা হয়, এটিও খুব জনপ্রিয়। লাল সোরেল পাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ থালি।

অন্ধ্র প্রদেশের সুস্বাদু সেরা খাবার

হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানী: হায়দ্রাবাদে এলে হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি খাবেন না, তা হয় না। হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি নবাবীকেতার মসলাদার মাংসযুক্ত ভাত– যা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। এ বিরিয়ানি গরম, মসলাদার এবং একটু রসালো।

কালিম: খাসির মাংস দীর্ঘক্ষণ ধরে রান্নার ফলে হাড়গোড় নরম হয়ে যায়। রমজানের সময় এটা খুব চলে।

পেসারাট্টু: মরিচ, লবণ ও আদা দিয়ে গরম সবুজ হর্স গ্রাম দিয়ে থালিটি প্রস্তুত করা হয়। আচার দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

মরিচ বাজ্জি: এটি মরিচ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। মরিচে দুধ ঢেলে হর্স গ্রাম ময়দা দিয়ে জ্বালানো হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুধা উদ্রেককারী আইটেম, আপনি খাবেন আর রুমাল দিয়ে চোখ মুছবেন।

উলাভা চরু: আপনি উপকূলীয় অঞ্চলে গেলে হর্স গ্রামের স্যুপের স্বাদ নিতে ভুলবেন না। প্রায় সব হোটেলে এ স্যুপটি পরিবেশন করা হয়।

মামসাম কুরা: এটি খাসির মাংসের মসলাদার থালি। কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ, আদা ও রসুন দিয়ে এটি রান্না করা হয়। ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা হলে এর সুগন্ধ আপনার জিভে জল আনবে।

বোম্মিডাল পুলুসু: পুলুসু মানে তরকারি। এটি ভাজা মাছ দিয়ে রান্না করা হয়। এটি প্রায় শহরের সব হোটেলে পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে নেল্লোর বোম্মিডাল পুলুসু সেরা।

বোঙ্গুলু চিকেন: এটা হল বাঁশ চিকেন। ছোট ছোট বাঁশের কাঠি দিয়ে মুরগির মাংস বেঁধে আগুনে ঝলসে পরিবেশন করা হয়। এটি সাধারণত পপিকোণ্ডালু ও আরাকু উপত্যকার আদিবাসীদের প্রিয় খাবার।

পুঠা রেকুলু: এটা এক ধরনের মিষ্টি– টিস্যু পেপারের মত পাতলা। এটা স্টার্চ, ঘি ও চিনি দিয়ে তৈরি। অন্ধ্রের শেষপাতে দেবার খাবার।

গোঙ্গুরা মাটন: এটা দক্ষিণ অন্ধ্রের সৌখিন খাবার। মাংসটা টক গোঙ্গুরা শাকের পাতা দিয়ে রান্না করা হয়। এটিও জিভে জল আনার মত খাবার।

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

বিশ্বশ্রুত চলচ্চিত্রস্রষ্টা সত্যজিৎ রায়

এক অবিস্মরণীয় সংগীত স্রষ্টা

কনকরঞ্জন দাস

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায় শুধু বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র স্রষ্টাই নন, একজন অবিস্মরণীয় সংগীত স্রষ্টাও। সংগীতে তার মহান কীর্তি চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। নৈপুণ্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়েছেন আমেরিকার 'একাডেমি অফ মোশন পিকচার্স' থেকে দেওয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'অস্কার'।

সংগীতের ব্যবহারিক ও উৎপত্তিক উভয় দিকেই সত্যজিৎ রায়ের ভীষণ দখল। তিনি নিজে সুর সৃষ্টি করে স্বরলিপি তৈরি করেন, পাশ্চাত্য ও ভারতীয় পদ্ধতিতে।

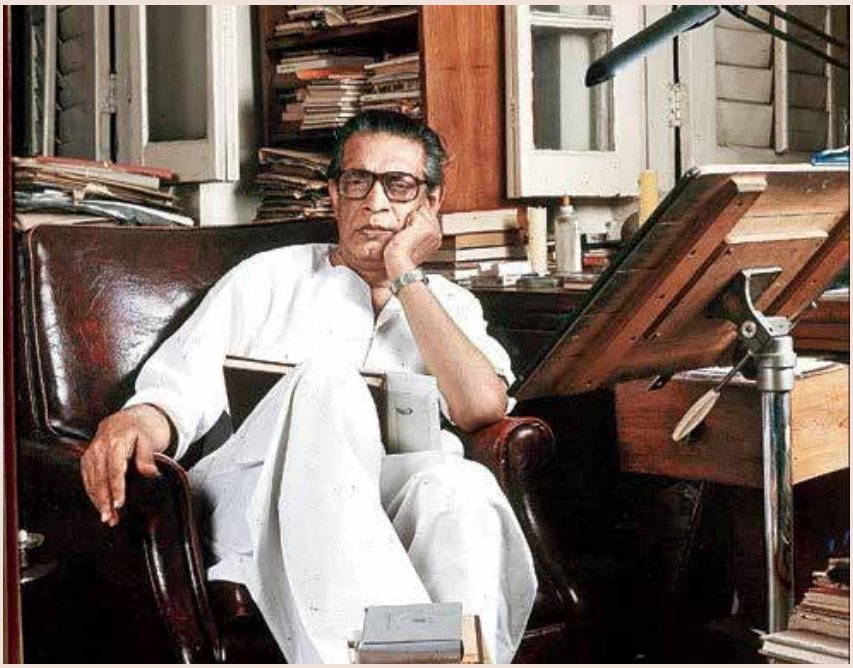

গায়কের প্রতিও নির্দেশ দিয়ে দেন কোন পদ্ধতিতে গাইতে হবে এবং যন্ত্রীদের বাদনশৈলীও তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। মৌলিক সৃজনশক্তির নিরলস সাধনা ও নিত্যনতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতার বর্ণবৈভব সংগীতে সফলতা এনে দিয়েছিল সত্যজিৎ রায়কে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পরে মা সুপ্রভা রায়ের ইচ্ছায় তিনি আসেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে। শান্তিনিকেতনে এসে পরিচিত হন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংগীতের মর্মজ্ঞ গুণী আশেকস অ্যারেনসসের সঙ্গে এবং এখানেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ধ্রুপদী পাশ্চাত্য সংগীতে। এছাড়াও ভারতীয় রাগসংগীত ও লোকসংগীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব প্রথম দিকে না নিলেও পরে তা নিজের কাঁধে তুলে নেন। ফলে চলচ্চিত্রে তাঁর ভাবনামত শৈল্পিক আমেজ ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সংগীতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে 'শেক্সপিয়রওয়ালা' ছবির আবহ সংগীতের জন্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর *দেবী* ছবিতে 'এবার তোরে চিনেছি মা' এবং *চিড়িয়াখানা* ছবিতে 'ভালবাসার তুমি কী জান' গীত রচনা ও সুর করে তা উপযুক্ত পরিবেশে ব্যবহার করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। বহু প্রশংসিত ও পুরস্কৃত ছবি *গুপী গাইন বাঘা বাইনে*'র গীত রচনা ও সুর সৃষ্টি করে তিনি শ্রেষ্ঠ সংগীত স্রষ্টা ও পরিচালকের পুরস্কার পান। এখানে বলা প্রয়োজন যে, সংগীত বলতে আমরা শুধুই গানকে বুঝে থাকি। চলচ্চিত্র বা নাটকের আবহ সংগীত আমাদের দৃষ্টি ও শ্রুতি এড়িয়ে যায়। গীত রচনা, সুর সৃষ্টি, আবহসংগীত, যন্ত্র-অনুষঙ্গ নির্মাণ, যন্ত্রীদের প্লেয়িং প্যাটার্ন, গাইবার ভঙ্গি এ-সবের সমন্বয়ে তিনি চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে সংগীতের ব্যবহার করেছেন।

সংগীত রেকর্ডিং ফ্লোরে সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ভারতের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ড. অনুপ ঘোষাল। সুর, স্বরলিপি এবং দেশী-বিদেশী যন্ত্র সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মুন্সিয়ানা ও সাফল্যের সঙ্গে যন্ত্রানুষঙ্গ তৈরি করতে পারতেন– যেমন সেতার, সরোদ, একতারা, দোতারা, বাঁশি, এস্রাজ, বেহালা, গিটার, তবলা, ঢোল, পাখোয়াজ, অ্যাকোর্ডিয়ান, অর্গান, ক্লে-ভাইলিন, সন্তুর, ক্লারিওনেট প্রভৃতির সমন্বয়ে তৈরি করতেন যন্ত্রানুষঙ্গ।

সত্যজিৎ রায়ের মজাদার কাহিনি *হীরক রাজার দেশে*র গীত ও সুর রচনা তিনি নিজেই করেন এবং এর জন্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের জাতীয় পুরস্কার পান। আর শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের জাতীয় পুরস্কার পান ড. অনুপ ঘোষাল। এই ছবির 'আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে', 'মোরা দু'জনায় রাজার জামাই', 'পায়ে পড়ি বাঘ মামা', 'এসে হীরক দেশে'– এই গানগুলো সুর, তাল, ছন্দ, লিরিক এবং যন্ত্রানুষঙ্গের সার্বিক সমন্বয়ে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক হয়ে অসংখ্য দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। *গুপী গাইন বাঘা বাইনে*'র তৃতীয় পর্ব *গুপী বাঘা ফিরে এল* পরিচালনা করেছেন তাঁর পুত্র সন্দীপ রায়। কিন্তু এর কাহিনি, গীত ও সংগীত পরিচালনা করেছেন সত্যজিৎ রায়। এ ছবির ১০টি গানে চমৎকার ও সফলভাবে কণ্ঠ দিয়েছেন ড. অনুপ ঘোষাল।

এহেন বহুমুখী প্রতিভার মূল্যায়ন কোন কিছু দিয়েই সম্ভব নয়– সত্যজিৎ রায়ের তুলনা তিনি নিজেই।

কনকরঞ্জন দাস
প্রাবন্ধিক

৩ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (আইজিসিসি) আয়োজনে খিলখিল কাজী ও সালাউদ্দীন আহমেদের পরিবেশনায় কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কবিতাআবৃত্তি ও সংগীতসন্ধ্যা

১৪ মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (আইজিসিসি) আয়োজনে আমিনা আহমেদ এবং মামুন জাহিদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যা

১৪ মার্চ ২০১৮ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (আইজিসিসি) আয়োজনে আমিনা আহমেদ এবং মামুন জাহিদের পরিবেশনায় রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যা

২৪ মার্চ ২০১৮ ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (আইজিসিসি) আয়োজনে শ্রীমতী মনীষা পাল চৌধুরীর পরিচালনায় 'সুরে ছন্দে শব্দে' শীর্ষক সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান

২৭ মার্চ ২০১৮ সন্ধ্যায় ঢাকার জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (আইজিসিসি) আয়োজনে সংগীতগুণী আজাদ রহমানের পরিচালনায় 'বাংলা খেয়াল' শীর্ষক শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra April 2018

বারিধারার কূটনৈতিক জোনে ভারতীয় হাই কমিশনে নবনির্মিত চ্যাঞ্চেরি ভবন

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in

/IndiaInBangladesh

@ihcdhaka

/HCIDhaka